াক্তর দ্বন্দ্বের মাধ্যমে।

## ভারত-মার্কিন সম্পর্ক (Indo-U.S. Relation) ঃ

আধুনিক বিশ্বে আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কোন একটি দেশের একক ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত হয় না। হতে পারে না। বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদ, জাতীয় অর্থনীতির অগ্রগতির হার, সামরিক শক্তি ইত্যাদির উপর এক দেশের সঙ্গে অন্যদেশের সম্পর্ককে নির্ধারণ করে। আধুনিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজনীতির নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চাইছে। একথা স্বীকৃত যে, সাম্প্রতিক বিশ্ব-রাজনীতির ধরন, এবং উপকরণ তাকে এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে সাহায্য করেছে। ইউরোপ-এশিয়া-আফ্রিকা জুড়ে এখন তার একাধিপত্যের প্রসারের উপায় সাজানো আছে। তবে একথাও স্বীকৃত যে, কোন দেশ যতই শক্তিশালী হোক না কেন এককভাবে নিজের ইচ্ছাকে অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো কোন মহাশক্তিধর শক্তির পক্ষেও তা সম্ভব নয়। ভারতের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই ধারণাটি স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

ভারত দক্ষিণ এশিয়ার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র। জনসংখ্যা, ভূখণ্ডের পরিমাণ, অর্থনৈতিক সামর্থ্য, সামরিক ক্ষমতা, প্রযুক্তির বিকাশ ইত্যাদি দিক থেকে বিচার করলে ভারতকে দক্ষিণ এশিয়ার এক নম্বর শক্তি বা এমনকী এই অঞ্চলের একটি মহাশক্তিধর রাষ্ট্র রূপে বিচার করলে অত্যুক্তি করা হবেনা।

বিশ্বের উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত এই দুটি দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রতি তার প্রভাব আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এই কারণেই ভারত-মার্কিন সম্পর্কের বিষয়টি স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হোল :

ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি চমকপ্রদ এবং আকর্ষণীয় আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী দেশ ভারত। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হোল বিশ্বের অন্যতম মহাশক্তিধর রাষ্ট্র। ভারত থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভারতের সম্পর্কের গুরুত্ব সম্পর্কে অনেকে সাধারণভাবে উন্নাসিকতা প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু ভূ-কেন্দ্রিক রাজনীতির বিচারে ভারত এমন এক স্থান অধিকার করে আছে, যা তাকে মার্কিন প্রশাসনের আকর্ষণের কেন্দ্রে পরিণত করেছে।

১৯৪৭ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ভারত-মার্কিন সম্পর্ক কোন সরলরেখা ধরে অগ্রসর হয়নি। আঁকা-বাঁকা পথ ধরে এই সম্পর্ক এগিয়ে চলেছে। এই সম্পর্ক বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি, স্বার্থ, নীতির বৈচিত্র্যের সংঘাতে কখনও উষ্ণ বন্ধুত্বে আবার কখনও বা চরম তিক্ততায় পরিণত হয়েছে।

ভারত-মার্কিন সম্পর্কের কয়েকটি নির্ধারক বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভারতের সঙ্গে আফ্রিকা, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চীন, পাকিস্তান এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক ভারত মার্কিন সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। ভারত—পাক বৈরিতা, ভারতের নির্জোট নীতি, উপনিবেশকতা, নয়া-উপনিবেশিক যুদ্ধ, আগ্রাসন, বর্ণ-বিদ্বেষ ও জাতি বৈরিতা-বিরোধী মনোভাব, সোভিয়েত এবং সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের প্রতি সহানুভূতির মনোভাব, সামরিক জোট ও সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের বিরোধিতার নীতিও উভয় দেশের সম্পর্কের নির্ধারকে পরিণত হয়েছে।

ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান তার আন্তর্জাতিক গুরুত্বের অন্যতম প্রধান কারণ। ভারত-পাক উপ-মহাদেশে যে শক্তি পা রাখার মতো জায়গা পাবে সেই শক্তি চীন, নেপাল, ভূটান, আফগানিস্তান, ইরান ও রাশিয়াকে সহজেই আঘাত হানার সামর্থ্যের এলাকার মধ্যে পাবে। সামরিক কৌশলের দিক থেকে সেই কারণেই এই উপ-মহাদেশের কোন না কোন রাষ্ট্রের উপর মার্কিন প্রভাব বিস্তারের প্রয়োজন ছিল। সামরিক উদ্দেশ্য ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতাদর্শগত উদ্দেশ্যও ছিল। দক্ষিণ এশিয়ায় সাম্যবাদ-বিরোধী প্রচারের একটি শক্তিশালী কেন্দ্র প্রয়োজন ছিল, যে কেন্দ্র থেকে চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য অ-সমাজতান্ত্রিক দেশের, বামপন্থী আন্দোলনের বিরুদ্ধে নিরন্তর মতাদর্শগত অপপ্রচার করা যায়।

উপরোক্ত বিচারে পাকিস্তান ছিল অত্যন্ত সংবেদনশীল। ভারতের প্রতি গভীর বিদ্বেষ এবং প্রতিশোধ-স্পৃহা স্বভাবতই তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে আকর্ষণ করেছে। ভারতকে প্রতিরোধের একমাত্র হাতিয়ার ছিল নিজের সামরিক সামর্থ্য বৃদ্ধি। ভারতের নির্জোট নীতির প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অসন্তোষ তাকে স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। পাকিস্তানের সামরিক সামর্থ্য বৃদ্ধির প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়াল উদার মার্কিনী সামরিক সাহায্য। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর পাকিস্তানের অগাধ বিশ্বাস ভারত-মার্কিন সম্পর্কের একটি নির্ধারকে পরিণত হয়েছে।

১৯৪৭-১৯৮৯ পর্যন্ত ভারত-মার্কিন সম্পর্ককে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত উভয় দেশ পরস্পরকে ভালভাবে অবহিত করার চেষ্টা করেছে। এই পর্যায়ের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে ভারত-মার্কিন মতান্তর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাশ্মীরে পাকিস্তানকে আক্রমণকারীরূপে গণ্য করতে অস্বীকৃত হয়। কাশ্মীরের কৌশলগত গুরুত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ভারত-পাক উপমহাদেশে হস্তক্ষেপ এবং প্রভাব বিস্তারের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। ১৯৪৭ সাল থেকে মার্কিন সরকার পাকিস্তানকে কাশ্মীর প্রশ্নে জাতিপুঞ্জ এবং অন্যত্র সমর্থন জানিয়েছে। পরে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের গিলগিটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে। ১৯৪৯-এর অক্টোবরে গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনে কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর অ-সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ভারতই প্রথম ঐ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। চীনের কমিউনিস্ট সরকারের প্রতি ভারতের এই সম্প্রীতি মার্কিন প্রশাসনের মনঃপূত হয়নি।

জোট-নিরপেক্ষতা এবং বিশ্বশান্তি সম্পর্কে ভারত স্বাধীন এবং নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। ভারত যদি মার্কিন প্রশাসনের মুখাপেক্ষী হয়ে আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যার বিষয়ে বিবেচনা এবং নীতি প্রণয়নের পথ গ্রহণ করত তাহলে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্নপথ অবলম্বন করত। মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব জন ফস্টার ডালেস ভারতের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি ভারত-পাক উপ-মহাদেশে পাকিস্তানকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বন্ধুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তবে ১৯৪৭-১৯৫০ সাল পর্যন্ত মার্কিন সরকার ভারতের সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ বিরোধ-জনিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করেনি।

১৯৫০-১৯৫২ সালের মধ্যে উভয় দেশ পরস্পর থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এর প্রধান কারণ ছিল, চীন-ভারতের মধ্যে সুসম্পর্ক এবং কোরিয়ার যুদ্ধে ভারতের ভূমিকা। ভারত সরকার কোরিয়ার যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেনি। তাইওয়ানের সাথে কোনপ্রকার সম্পর্ক না রাখা, জাতিপুঞ্জে গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের সদস্যপদ অর্জনের জন্য ভারতের উদ্যোগ মার্কিন প্রশাসনের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছে।

১৯৫৩-১৯৬০ সাল ভারত-মার্কিন সম্পর্কের অবনতির প্রধান কারণ ছিল পাকিস্তানের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্ধ সমর্থন। কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান জাতিপুঞ্জে ভারতের বিরুদ্ধে প্রবল বিরোধিতার ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানকে সমর্থন করেছে। শুধু তাই নয়, ১৯৫৩-১৯৬০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট থেকে বিপুল পরিমাণ সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য পেয়েছে। এর ফলে ভারত নিরপত্তার অভাব অনুভব করেছে। তার প্রতিরক্ষার স্বার্থ ব্যহত হয়েছে। ঐ সময়ে চীন-ভারত মৈত্রী স্থাপন, পঞ্চশীল এবং বান্দুং সম্মেলনের সাফল্যও ভারত সম্পর্কে মার্কিন সরকারের মনে আশংকা সৃষ্টি করেছে।

ষাটের দশকে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হোল, ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ এবং ঐ যুদ্ধের ফলে সকল মার্কিন সাহায্য বন্ধ। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত-বিরোধের সময়ে ভারতের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আকার ধারণ করে। মার্কিন প্রশাসন ভারতকে অস্ত্র সরবরাহে সম্মতি

জ্ঞাপন করে। ভারতের প্রতি সহযোগিতা ও সহানুভূতির মাধ্যমে মার্কিন প্রশাসন শুভেচ্ছা অর্জনের চেষ্টা করেছে। একই সঙ্গে ভারত এবং পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঐ সময়ে চীনের বিরোধী থাকলেও চীন-পাক বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে কোন বাধা সৃষ্টি করেনি।

চীন-ভারত সীমান্ত-বিরোধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে সাহায্য করলেও কাশ্মীর-সমস্যার সমাধানের জন্য পাকিস্তানের সাথে আলোচনার জন্য ভারতকে চাপ দিয়েছিল। এর ফলেই ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল এবং মে মাসে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে কয়েক দফা আলোচনা হয়। কিন্তু কোন গ্রহণযোগ্য সমাধান সূত্র নির্ধারণ করা যায়নি।

১৯৬৫-র সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান আকস্মিকভাবে কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করে ভারতের উপর আক্রমণ শুরু করে।

মার্কিন সরকার ঐ যুদ্ধে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আয়ুব খানের অনুরোধ সত্ত্বেও মার্কিন সরকার কোন হস্তক্ষেপ করেনি। চীন যেন ঐ যুদ্ধে হস্তক্ষেপ না করে, মার্কিন সরকার সেই বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশকেই সাময়িকভাবে অর্থনৈতিক এবং সামরিক সাহায্য দান বন্ধ করে।

১৯৬৬-র জানুয়ারি মাসে ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি ভারতের খাদ্য-সমস্যা, মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আলোচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শ্রীমতী গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হবার পূর্বেই ১৯৬৫-র ডিসেম্বরে পি. এল. ৪৮০ অনুসারে খাদ্য সরবরাহের সিদ্ধান্ত মার্কিন সরকার ঘোষণা করে। ঐ ঘোষণার ছ-মাসের মধ্যে মার্কিন সরকার ৮ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য সরবরাহ করে।

১৯৬৬-র ২৮শে মার্চ থেকে ১লা এপ্রিল পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। রাষ্ট্রপতি লিণ্ডন জনসন ভারতের সমস্যা সম্পর্কে সহানুভূতি প্রকাশ করেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি সোভিয়েতের সাথে ভারতের সম্পর্কের পুনর্বিবেচনার শর্তে ভারতকে সাহায্য দেবার মনোভাব প্রকাশ করেন। হোয়াইট হাউসে রাষ্ট্রপতি জনসন-প্রদত্ত ভোজসভায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, এশিয়ায় ভারতের অবস্থানের জন্য ভারতের সমস্যাকে বিশেষ সমস্যা বলা যায়। ভারত যদি স্থিতিশীল না হোতে পারে বা ভারত যদি ব্যর্থ হয় তাহলে এই ব্যর্থতা হবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতা হবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতির কাছে অতিপ্রিয় মূল্যবোধের ব্যর্থতা।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, চীন শান্তি এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিরোধী। তিনি ভারতের অনুসৃত প্রতিরূপ (Model)-কে এশিয়ার অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তনের বিকল্প প্রতিরূপ বলে মন্তব্য করেন। ইন্দিরা-জনসন যৌথ ঘোষণায় বলা হয়েছিল যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভারতের স্বাধীনতা এবং সংহতি রক্ষার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা ও সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের আগ্রাসী নীতির ভীতি ব্যাখ্যা করেছেন। প্রধানমন্ত্রীকে মার্কিন সরকারের তরফ থেকে পাকিস্তানকে কাশ্মীর প্রশ্নে সুবিধা দিয়ে চীনের আক্রমণের বিপদ প্রতিরোধের জন্য ভারতকে পরামর্শ দেওয়া হয়। ভারতের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করা হয় যে, ভারত স্থিতিশীল পাকিস্তান চায়। ভারত

পাকিস্তানের সাথে যৌথ অর্থনৈতিক প্রকল্প প্রণয়নে উৎসাহ প্রকাশ করে। কাশ্মীরে গণভোটের প্রশ্নে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিরোধিতা প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী ভিয়েতনামের যুদ্ধের বিষয়ে ভারতের মতামত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। যৌথ ঘোষণায় বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে মার্কিন রাষ্ট্রপতি-প্রদত্ত ইন্ডো-ইউ. এস. ফাউন্ডেশন গঠনের প্রস্তাবের উল্লেখ ছিল। তবে এই প্রস্তাব ভারতের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল।

১৯৬৬ সালে ইন্দিরা গান্ধীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরকে ভারত-মার্কিন সম্পর্ককে শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, ব্যাপক এবং দৃঢ়তাপূর্ণ পদক্ষেপ বলা যায়। চীন-সোভিয়েত বিরোধ, সোভিয়েত-মার্কিন বোঝাপড়ার প্রয়াস, চীনের সাথে ভারতের বিরোধ, ভারতের আর্থিক সংকট ও জাতীয় প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভারতের বন্ধুত্বে সুদৃঢ়করণে সাহায্য করেছে।

১৯৬৬ সালের ১লা জুন ভারত-মার্কিন চুক্তির ফলে মার্কিন সরকার ভারতকে ৪৮·৮ মিলিয়ন ডলার ঋণ দেয়। দুর্গাপুর-সহ দুটি থারমাল পাওয়ার কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ঐ ঋণ দেওয়া হয়। ১৯৬৭-র ২০শে ফেব্রুয়ারি পি. এল. ৪৮০-র আধীনে খাদ্য সরবরাহ-সংক্রান্ত আর একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। ঐ চুক্তি অনুসারে ১৯৬৭-র প্রথম ছ' মাসের মধ্যে ভারতকে ৩·৬ মিলিয়ন টন খাদ্য সরবরাহের সিদ্ধান্ত হয়। ঐ বছর ১৪ই মার্চ আর একটি চুক্তি অনুসারে পি. এল. ৪৮০ তহবিল থেকে ২৮৮·৪ কোটি টাকার ঋণ দেওয়ার চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৯৬৭-র ১২ই সেপ্টেম্বর পি. এল. ৪৮০ কর্মসূচীর অধীনে ভারতকে গম, ভোজ্য তেল, কার্পাস সরবরাহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মার্কিন রাষ্ট্রপতি জনসন ১৯৬৮ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি মার্কিন কংগ্রেসে এক বাণীতে খাদ্য-সমস্যার অভাবপূরণের ক্ষেত্রে ভারতের চমকপ্রদ সাফল্যের বিষয় উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেন ১৯৬৮ সালে ভারতের আমদানির অর্ধেক অর্থ ইউ. এস. এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট সরবরাহ করেছে। তিনি অন্যান্য সম্পদশালী দেশকে ব্যাপকহারে এবং যুক্তিসঙ্গত শর্তে ভারতকে বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহের জন্য অনুরোধ করেন।

১৯৬৮ সালের ৮ই মার্চ পি. এল. ৪৮০ তহবিল থেকে ভারতকে ৩১৯ কোটি টাকার তিনটি ঋণ দেওয়া হয়। ঐ বছরই ১৫ই মে শিল্পজাত এবং কৃষিজাত পণ্য আমদানির জন্য ভারতকে ১৬৮·৭৫ কোটি টাকার ঋণ দেওয়া হয়। এর মধ্যে ১০০ মিলিয়ন ডলার কৃষির জন্য ব্যয় করার শর্ত ছিল। ৫ই জুলাই ট্রম্বে সার কারখানার জন্য ৩৬·৯ মিলিয়ন ডলার ঋণ দেওয়া হয়।

ষাটের দশকে মার্কিন সরকার কর্তৃক ভারতকে প্রদত্ত ঋণ এবং সাহায্যের একটি বৈশিষ্ট্য হোল, ভারতে বৃহৎ শিল্পগঠনের মাধ্যমে তার দ্রুত শিল্পায়নের ক্ষেত্রে কোন মার্কিন ঋণ এবং সাহায্য পাওয়া যায়নি। কৃষি, পরিবহন, যোগাযোগ-ব্যবস্থা, কাঁচামাল ও খনিজ সম্পদের জন্যই বেশির ভাগ অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। প্রাপ্ত ঋণ এবং সাহায্যের একটি বৃহৎ অংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কৃষি এবং শিল্পজাত পণ্যাদি আমদানির জন্য ব্যয় করতে হয়েছে।

ষাটের দশকই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঋণ এবং সাহায্যের মাধ্যমে ভারতকে তার কাছাকাছি নিয়ে আসার চেষ্টা করেছে। ভারতকে তার দুরূহ খাদ্য-সমস্যা, মুদ্রাস্ফীতি, বৈদেশিক ঋণের বোঝা এবং জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনে মার্কিন সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই

সুযোগে ভারতের পররাষ্ট্রনীতিকে চীন ও সোভিয়েতের বিরোধী করে তোলার চেষ্টা করেছে। পাকিস্তানের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসার জন্য চাপ দিয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি অনেকটাই মার্কিন-নির্ভর হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এই দশকের শেষদিকে ভারতের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের দিকে অগ্রসর হবার ফলে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ভারত অনেক বেশি আত্মবিশ্বাস নিয়ে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি প্রয়োগের পথে অগ্রসর হতে পেরেছে।

ষাটের দশকের একটি উল্লেখ্য ঘটনা হোল, ১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সরকারী সচিব কাটজেনবাক (Katzenbach)-এর নেতৃত্বে মার্কিন প্রতিনিধি দলের ভারত-সফর। এই সফরে উভয় পক্ষের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। ভিয়েতনাম যুদ্ধের ফলে ঐ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা প্রকট রূপ ধারণ করে। ভারতকে সাহায্যদানের ক্ষেত্রে সেই কারণেই মার্কিন সরকার নতুন ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছিল। মার্কিন সরকার মনে করেছিল যে, ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য ১৭৫ মিলিয়ন ডলারের বেশি সাহায্য দেওয়া সম্ভব নয়। কাটজেনবাক চীন-মার্কিন, মার্কিন-রুশ সম্পর্কের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু কাশ্মীর-সমস্যা সমাধানের বিষয়ে মার্কিন প্রতিনিধিদল কোন মন্তব্য করেনি।

১৯৬৭ সালের জুনে পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধে ভারত আরব রাষ্ট্রসমূহের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছে। এর ফলে শুধু মার্কিন জনগণই নন, মার্কিন কংগ্রেসের ইহুদি সদস্যগণও ভারতের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। ১৯৬৯ সালের ৩১শে জুলাই থেকে ১লা আগস্ট নব-নির্বাচিত মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসন ভারত-সফর করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনার সময়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। মার্কিন পক্ষ থেকে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় যে, ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পর চীন ভিয়েতনামে প্রবেশ করবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। ভারতের পক্ষ থেকে এশিয়ার ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের ভূখণ্ড অখণ্ডতা রক্ষার জন্য জেনিভা ধাঁচের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মাধ্যমে গ্যারান্টির প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, ব্রিটেন ও চীন ঐ গ্যারান্টি দেবে।

সত্তরের দশকে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক স্বাভাবিক ছিল বলা চলে না, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ষাটের দশকের শেষে ভিয়েতনাম ও মধ্যপ্রাচ্যের বিষয়ে মার্কিন নীতিকে ভারত গ্রহণ করেনি। হ্যানয়ে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত প্রেরণ, মধ্যপ্রাচ্যে ইজরায়েলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভারতের তীব্র প্রতিক্রিয়া মার্কিন প্রশাসন ভালমনে গ্রহণ করেনি। পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দানও ভারতের উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করেছে।

১৯৭০ সালের ৭ই অক্টোবর মার্কিন সরকার পাকিস্তানকে বি-৫৭ বোমারু-বিমান এবং ইণ্টারসেপটর-সহ মারাত্মক ধরনের অস্ত্র সরবরাহের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এর আগে তুরস্কের মাধ্যমে পাকিস্তানকে ১০০ প্যাটন ট্যাঙ্ক সরবরাহ করা হয়েছে। চীনের নিকট থেকেও পাকিস্তান সমরাস্ত্র পেয়েছে। মার্কিন প্রশাসন পাকিস্তানের মাধ্যমে চীনের সঙ্গে গোপন কূটনীতি চালিয়ে যাচ্ছিল। মার্কিন-চীন-পাকিস্তানের বোঝাপড়া দক্ষিণ এশিয়ায় নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল।

১৯৭১ সালের মার্চে প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লিগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণা করেন। পাকবাহিনী নৃশংসভাবে বাংলাদেশের জনগণের আন্দোলন দমনের চেষ্টা করে। প্রতিদিন হাজার হাজার শরণার্থী ভারতে আসতে শুরু করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিভিন্ন দেশ সফর করে বাংলাদেশের সমস্যা সম্পর্কে সেইসব দেশের নেতাদের অবহিত করেন। ভারতের তরফ থেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয় যে, পাকিস্তানের অস্থিতিশীলতা ভারতের কাম্য নয়। কিন্তু ক্রমবর্ধমান শরণার্থীদের চাপ সহ্য করা ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের আবেদনে সাড়া দেয়নি। পাকিস্তানের প্রতি মার্কিন মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি। রাষ্ট্রপতি নিকসন এবং তাঁর জাতীয় নিরাপত্তা-বিষয়ক উপদেষ্টা হেনরী কিসিঙ্গার ভারতের প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ করেন। এই পরিস্থিতির মধ্যে ১৯৭১ সালের আগস্টে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি সম্পাদনে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটে।

১৯৭১ সালের ১লা ডিসেম্বর পাকিস্তান বিনা প্ররোচনায় অতর্কিতে ভারতের উপর ব্যাপক আক্রমণ শুরু করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঐ আক্রমণের নিন্দা করেনি। ভারতীয় বাহিনী পূর্ব-পাকিস্তানের পাক-বাহিনীর উপর পাল্টা-আক্রমণ শুরু করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে প্রেরণ করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতের উপর সামরিক চাপ সৃষ্টি এবং পাকিস্তানের মনোবল বৃদ্ধি করা। ডিসেম্বর মাসে পাক বাহিনী ভারতের নিকট আত্মসমর্পণ করে। জন্ম হয় স্বাধীন বাংলাদেশের। বাংলাদেশের জন্ম ভারত-মার্কিন সম্পর্কে সংকট সৃষ্টি করে। এই সংকট এমন সময় সৃষ্টি হয়েছিল, যখন মার্কিন প্রশাসন চীনকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ এশিয়ায় নতুন সামরিক ও কূটনৈতিক রণকৌশল প্রয়োগের প্রয়াস আরম্ভ করেছিল। তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড এবং পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে শক্তিসাম্য গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল, তা ভেঙে পড়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের প্রভাব বৃদ্ধি করেছে।

১৯৭৪ সালে রাজস্থানের পোখরানে আণবিক বিস্ফোরণে ভারত সাফল্য অর্জন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ঐ সাফল্য অসহ্য ছিল। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে ভারতে অর্থনৈতিক সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস এবং তারাপুর আণবিক প্রকল্পের জন্য জ্বালানী সরবরাহের ক্ষেত্রে অসহযোগিতার জন্য মার্কিন প্রশাসন তৎপর হয়ে ওঠে। ১৯৭৭ সালে ভারতে জনতা সরকার ক্ষমতাসীন হয়। ঐ সরকার পাকিস্তান এবং সোভিয়েত সম্পর্কে পূর্বতন সরকারের নীতি বজায় রাখে। এর ফলে সত্তরের দশকে উভয় দেশের সম্পর্কের উন্নয়নের আর কোন সম্ভাবনাই ছিল না। তবে ১৯৭৮ সালের জানুয়ারিতে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টারের ভারত-সফর উন্নত সম্পর্কের প্রত্যাশা সৃষ্টি করেছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে এক যৌথ ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে, মজুত আণবিক অস্ত্র হ্রাস এবং তার চূড়ান্ত ধ্বংস সাধনের মাধ্যমে আণবিক অস্ত্রের প্রসার রোধ করতে হবে। সাবেকী অস্ত্রের পরিমাণ হ্রাস করে ঐ উৎপাদিকা-শক্তিকে মানবজাতির কল্যাণে নিয়োজিত করতে হবে।

আশির দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতির ফলেই সম্পর্কের উন্নতির সম্ভাবনা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। ১৯৮১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে তিনশ' কোটি ডলার মূল্যের সামরিক

সম্ভার সরবরাহের জন্য চুক্তি সম্পাদন করেছে। ১৯৭৭ সালের পর থেকে পাকিস্তান আণবিক বোমা তৈরির জন্য যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। পাকিস্তান ভারতের আক্রমণের অজুহাতে বিপুল পরিমাণ সামরিক সাহায্য আদায় করেছে। মার্কিন প্রশাসনও উদারভাবে তা সরবরাহ করেছে।

১৯৮২ সালের ২৮শে জুলাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী ৯ দিনের জন্য মার্কিন-সফর শুরু করেন। ইন্দিরা গান্ধী তাঁর ঐ সফরকে 'বোঝাপড়া এবং বন্ধুত্বের সন্ধানের জন্য এক অভিযান' ("adventure in search of understanding and friendship") নামে উল্লেখ করেছেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ঐ সফরকে 'আবিষ্কারের সংলাপ' ("dialogue of discovery") বলে অভিহিত করেছেন। এই সফরের মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে শুভেচ্ছা এবং বোঝাপড়া প্রসারের পথ প্রশস্ত হয়। প্রধানমন্ত্রী ভারতের নীতির মূল বক্তব্য যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং তিনি পাকিস্তানকে ক্রমবর্ধমানহারে মার্কিন অস্ত্রসরবরাহের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। আফগানিস্তানের বিষয়ে ভারতের অবস্থানও ব্যাখ্যা করেন।

১৯৮৩ সালের জুন-জুলাই মাসে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জর্জ শুল্‌জ-এর ভারত সফরের সময়ে তারাপুর আণবিক শক্তিকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহের বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। স্থির হয় যে, ভারত ঐ প্রয়োজনীয় উপকরণ অন্য কোন দেশ থেকে সংগ্রহের চেষ্টা করবে এবং অন্য দেশ থেকে তা সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে সহযোগিতার জন্যও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২রা জুলাই শুল্‌জ নতুন দিল্লিতে ঘোষণা করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে সামরিক সম্ভার বিক্রয়ে ইচ্ছুক। তবে ভারত তা ক্রয় করবে কিনা, ভারতের উপরই নির্ভর করবে। পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ থেকে শুরু করে অন্যান্য কয়েকটি বিষয় নিয়েও ভারত-মার্কিন ভুল-বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়। মার্কিন প্রশাসন পাকিস্তানে প্রতি-বিপ্লবী আফগানদের প্রশিক্ষণের জন্য যে উন্নতমানের অস্ত্র সরবরাহ করেছিল, ভারতের অনুমান তার একাংশ ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান ব্যবহার করবে। মার্কিন প্রশাসনও এ বিষয়ে অবহিত। মার্কিন প্রশাসন ভারতের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করেছিল। ভারত পাকিস্তানের আণবিক কেন্দ্রের উপর আঘাত হানতে পারে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই মর্মে পাকিস্তানকে সতর্ক করে দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদি গোপনে পাকিস্তানে সরবরাহের অভিযোগ করেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। ১৯৮৪ সালের ১লা অক্টোবর মার্কিন সেনেটে স্বীকার করা হয় যে, কৃত্রিম উপগ্রহ ভারতে জাগুয়ার বিমানের অবস্থানস্থলের চিত্র গ্রহণ করেছে। মার্কিন সরকার পাকিস্তানকে সতর্ক করেছে যে, ভারত অতর্কিতে পাকিস্তানের আণবিক ঘাঁটি আক্রমণ করতে পারে। তা ছাড়া পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ঘোষণা করেন যে, ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করলে মার্কিন সরকার পাকিস্তানের সাহায্যে এগিয়ে আসবে।

এভাবে ভারতের বিরুদ্ধে প্ররোচনামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে এফ-১৬ বোমারু বিমান, ডেস্ট্রয়ার এবং উন্নতমানের সমরাস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিখ উগ্রপন্থীদের ভারত-বিরোধী ক্রিয়াকলাপ ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তিক্ততা সৃষ্টি করেছে।

১৯৮৫ সালের জুন মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান। ১৯৮৫ সালের ১৫ই জুন রেগন ও রাজীব গান্ধী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রতিরোধের জন্য এক যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মার্কিন কংগ্রেসে ভাষণের প্রাক্কালে মহাশূন্যে সামরিকীকরণ ও পারমাণবিক অস্ত্রযুদ্ধের বিরোধিতা করেন। তিনি জোট-নিরপেক্ষতার নীতির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। রাজীব গান্ধী অক্টোবর মাসের শেষদিকে পুনরায় রেগনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বৈশ্বিক আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে রেগনের কাছে ভারতের অভিমত ব্যক্ত করেন।

১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে স্থির হয়, উন্নতমানের কারিগরি হস্তান্তরের জন্য ভারতে দুটি উচ্চ পর্যায়ের মার্কিন সমীক্ষক দল পাঠানো হবে। ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বি. আর. ভগত ইন্দো-আমেরিকান জয়েন্ট কমিশনের সভায় যোগ দেবার জন্য ওয়াশিংটন যান। ভারত-মার্কিন তহবিল গঠন করা যায় কিনা, এটাই প্রধান লক্ষ্য ছিল। ১৯৮৩ সালে ঐ কমিশন গঠিত হয়। ঐ বছর জানুয়ারি মাসে ২৫০টি বিজ্ঞান প্রকল্প রূপায়ণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভরতকে ১০০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দিয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার সরবরাহে সম্মত হয়েছে।

১৯৮৬ সালের ১১ই অক্টোবর মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব ক্যাসপার ওয়েনবার্জার ভারত সফরে আসেন। তিনি ভারতকে যৌথভাবে সামরিক সম্ভার উৎপাদনের প্রস্তাব দেন। আলোচনার পর তিনি উন্নতমানের প্রযুক্তির হস্তান্তর এবং সুপার কম্পিউটার সরবরাহে সম্মত হন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, ভারত সফরের পর পাকিস্তানে গিয়েই তিনি ঘোষণা করেন, পাকিস্তানের জন্য যত দ্রুত সম্ভব তিনি এ.ডব্লিউ. এ সি. এস. (AWACS—Airborne warning and control system) সরবরাহে ইচ্ছুক।

১৯৮৭ সালের অক্টোবরে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। ২০শে অক্টোবর রাজীব গান্ধী এবং রেগন ঘোষণা করেন যে, মার্কিন সাহায্যে নির্মিত জঙ্গী-বিমান প্রকল্প ছাড়াও মার্কিন সরকার প্রতিরক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতার সম্ভাবনার বিষয় বিবেচনা করবে। মার্কিন সরকার স্পষ্টভাবে প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে দেয় যে, ভারতকে উচ্চমানের প্রযুক্তি সরবরাহ করা সম্ভব হবে না। রাজীব-রেগন যৌথ ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যৌথ গবেষণা পরিচালিত হবে। এই খাতে মার্কিন প্রশাসন ১,২৭৫ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে। তাছাড়া বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং কৃষির ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সাব-কমিশনের কাজ অব্যাহত রাখার জন্য আমেরিকান এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশন্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রতি বছর ৩ কোটি ডলার সাহায্য করবে। এই ধরনের কর্মসূচীর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্য কোন দেশে এত অর্থ বরাদ্দ করেনি।

১৯৮৭ সালের ১১ই নভেম্বর রাজ্যসভায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি ক্রয় করছে। ঐ প্রযুক্তি অত্যন্ত উন্নতমানের বলেও তিনি ঘোষণা করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে সুপার কম্পিউটার সরবরাহে সম্মত হয়েছে। ১৯৮৭ সালে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রায় ৫কোটি ৭০ লক্ষ টাকার অস্ত্র ক্রয় করেছে।

১৯৮৮ সালে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে ১৯৮৭ সালে গৃহীত ব্যবস্থাদি রূপায়ণের চেষ্টা করা হয়। উভয় দেশের উচ্চতর পর্যায়ের ব্যক্তিগণ উভয় দেশে সফরে যান। ১৯৮৮ সালের এপ্রিলে মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব ফ্রাঙ্ক কারলুচ্চি ভারতে আসেন। ১৯৮৮ সালের অক্টোবর ও ডিসেম্বরে যথাক্রমে মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রধান এবং প্রতিরক্ষা দপ্তর ও পররাষ্ট্র দপ্তরের সহকারী সচিব ভারতে আসেন। তাছাড়া মার্কিন প্রতিনিধি সভার এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক অ্যাফেয়ার্স সাব-কমিটির চেয়ারম্যান স্টিফেন সোলার্জ এবং ঐ সাব-কমিটির অন্য দু'জন সদস্য ভারত-সফর করেন ও ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী কে. নটবর সিং-এর সঙ্গে আঞ্চলিক এবং দ্বি-পাক্ষিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ১৯৮৮ সালের অক্টোবরে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কিন রাষ্ট্রপতি রেগন এবং পররাষ্ট্র সচিব জর্জ শুল্‌জের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

১৯৮৮-র জানুয়ারিতে প্রযুক্তি স্থানান্তর সম্পর্কে মউ (Mou : Memorandum of Understanding)-এর পর্যালোচনা বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রযুক্তি স্থানান্তর-এর পদ্ধতিগত দিক নিয়েও আলোচনা হয়। ১৯৮৮ সালে নিয়ন্ত্রিত প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ের জন্য যে রপ্তানি লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে তার মূল্য ছিল প্রায় ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৮৮-র অক্টোবরে ভারতকে ক্রে একস্. এম পি.-১৪ সুপার কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে। নতুন দিল্লিতে ভারতীয় আবহবিদ্যা বিভাগের সীমানার মধ্যে তা স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৮৭ সালে প্রধানমন্ত্রীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময়ে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি-বিষয়ক উদ্যোগের (Science and Technology Initiative-STI) মেয়াদ তিন বছর পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়। ১৯৮৮-র আক্টোবরে রাষ্ট্রপতি রেগন-এর বিজ্ঞান-বিষয়ক উপদেষ্টা ডঃ ডব্লিউ আর গ্রাহাম এবং ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে এই উদ্যোগের মেয়াদ ১৯৯১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রসারিত করেন। ১৯৮৮ সালে দ্বৈত কর ধার্যের ব্যবস্থা দূর করার জন্য একটি চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে বিবেচনা করা হয়। ১৯৮৯ সালে ঐ বিষয়ে চুক্তি সম্পাদিত হবে বলে আশা করা হয়েছিল।

১৯৮৯-এর ১০ই জানুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে ৬২১ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এর মধ্যে সামরিকখাতে বরাদ্দ হয়েছে ২৪১ মিলিয়ন ডলার। অথচ ১৯৯০-এর আর্থিক বছরের জন্য ভারতকে প্রদত্ত মার্কিন সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১১০.৪০ মিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে সামরিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৪০·০০০ মিলিয়ন ডলার।

১৯৮৯-এর ২২শে মে ভারত মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র 'অগ্নি' উৎক্ষেপণে সাফল্য অর্জন করে। উন্নতমানের ক্ষেপণাস্ত্র-বিষয়ক কারিগরীর ক্ষেত্রে এ এক বিরাট সাফল্য। ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণে ভারত বিশ্বের সফল পঞ্চম রাষ্ট্র। অগ্নি-র নিশানা ২,৫০০ কিলোমিটার। এর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট ব্রিটেন এবং ফ্রান্স ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণে সাফল্য অর্জন করেছে। অনেকে এই আশংকা প্রকাশ করেছিলেন যে, এরপর হয়তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে উন্নতমানের প্রযুক্তি হস্তান্তরের বিষয়-সম্পর্কিত আলোচনা বন্ধ করে দেবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সাফল্যে উদ্বেগ প্রকাশ করলেও প্রযুক্তি হস্তান্তর সম্পর্কে কোন তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেনি। মার্কিন প্রশাসনের মতে ক্ষেপণাস্ত্রের প্রসার দক্ষিণ এশিয়ার অস্থিতিশীল পরিস্থিতির প্রসার ঘটাবে।

১৯৮৯-এর ভারত-মার্কিন সম্পর্কের একটি বিশেষ দিক হোল এই যে, বাণিজ্যের দিক থেকে ভারতকে পৃষ্ঠপোষিত বা সুবিধা ভোগকারী জাতি' (favoured nation)-র সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়।

ঐ বছর ২৪শে মে ভারত-মার্কিন যৌথ বাণিজ্যিক পরিষদের সাথে যুক্ত ভারতীয় ব্যবসায়িগণ মার্কিন ব্যবসায়ী ও সরকারী দপ্তরের সাথে আলোচনা শেষে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ১৯৮৮-র মার্কিন বাণিজ্যিক আইনের ৩০১ নং ধারা অনুযায়ী মার্কিন সরকার ভারতকে কালো তালিকাভুক্ত করতে পারে। এই বিষয়ে ভারতের সাথে ফলপ্রসূ আলোচনা না হলে মার্কিন সরকার ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ সম্পর্কে ভারতের নীতি এবং উচ্চ হারে আমদানি-শুল্ক ধার্যই এর মূল কারণ। জাপান, ব্রেজিল, দক্ষিণ কোরিয়া এবং তাইওয়ানের বিরুদ্ধেও মার্কিন সরকার একই অভিযোগ উত্থাপন করেছে। ১৯৮৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভারতের বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ছিল ৭০০ মিলিয়ন ডলার। পক্ষান্তরে, অন্যান্য দেশের বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল কয়েক হাজার বিলিয়ন ডলার। ১৯৮৮ সালেই ভারতের সাথে মার্কিন রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৭০%। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে উন্নতমানের প্রযুক্তি এবং শক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাদি আমদানির জন্য ভারতকে যে পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা দিতে হবে তার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভারতের বাণিজ্য প্রতিকূল হতে বাধ্য। ২৫শে মে মার্কিন বাণিজ্যিক প্রতিনিধি কার্লস হিলস মন্তব্য করেন, বিদেশী বিনিয়োগের উপর নিষেধাজ্ঞা ও বাধা অপসারণ এবং ভারতে বীমা ব্যবসায়ে বিদেশী কোম্পানিসমূহের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা না হলে মার্কিন সরকার ভারতের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী দীনেশ সিং মার্কিন আইন ও ব্যবস্থাকে অন্যায় ও অসঙ্গত বলে বর্ণনা করেছেন।

১লা জুন ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন আর. হুয়ার্ড উল্লেখ করেন, ভারতের প্রধান বাণিজ্য শরিক হোল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই সম্ভাবনাকে কার্যকর করার জন্য মার্কিন সরকার বাণিজ্য-সম্পর্কে কঠোর মনোভাব অবলম্বন করেছে। ভারত ও জাপানের প্রতিনিধিগণ এই বিষয়ে আলোচনার জন্য জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে মিলিত হন। ২৭শে মে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র রিচার্ড বাউচার নেপালের সাথে বাণিজ্য বিষয়ে আলোচনায় বসার জন্য ভারতকে অনুরোধ জানান। মার্কিন সরকার ভারত-নেপাল বাণিজ্য বিরোধে নেপালের প্রতিই সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছে।

মে মাসে মার্কিন প্রশাসন ভারতকে ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার যন্ত্র সরবরাহের বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর এবং সি. আই. এ. ঐ যন্ত্র বিক্রির লাইসেন্স বন্ধ রাখার জন্য বাণিজ্য-দপ্তরকে অনুরোধ করে। তাদের ধারণা, ঐ যন্ত্রের সাহায্যে ভারত আণবিক বোমাবাহী ক্ষেপণাস্ত্র প্রস্তুত করতে পারবে। ১৯৮৪ সালে মার্কিন বাণিজ্য-দপ্তর বিক্রির লাইসেন্স অনুমোদন করেছিল।

১৯৮৯-এর জুনের প্রথম সপ্তাহে পাক-প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় মার্কিন প্রশাসন পাকিস্তানকে ৬০টি এফ-১৬ বিমান সরবরাহে সম্মত হয়। পাক-প্রতিরক্ষার সামর্থ্য বৃদ্ধির এই উদ্যোগ ভারতে উদ্বেগ সঞ্চারিত করেছে। ১৯৮৯-এর জুনের শেষদিকে

মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য ওয়ালী হার্জার পাঞ্জাবে মানবিক অধিকার লঙ্ঘন এবং নেপালের বিরুদ্ধে বাণিজ্য অবরোধের অভিযোগে ভারতকে মার্কিন সাহায্যের পরিমাণ হ্রাসের জন্য কংগ্রেসে একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯৯০ সালের অক্টোবর থেকে একটি আর্থিক বছরের জন্য মার্কিন প্রশাসন ভারতকে উন্নয়ন খাতে ৫ মিলিয়ন ডলারসহ মোট ১১০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেছিল। ঐ সময়ে পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল ৬২০ মিলিয়ন ডলার। ইজরায়েল এবং মিশরের পরেই পাকিস্তান মার্কিন সাহায্যের বড় অংশীদার। মার্কিন সরকার বাণিজ্যিক এবং সামরিক কারণে পাকিস্তানকে এফ-১৬ জঙ্গী বিমান বিক্রির সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে। ৩রা আগস্ট কংগ্রেসের দুটি কক্ষের পররাষ্ট্র-বিষয়ক কমিটির নিকট এক শুনানীর সময়ে পেণ্টাগনের মুখপাত্র আর্তার হিউজেস উল্লেখ করেন, মার্কিন সরকার ঐ বিমান সরবরাহ না করলে ফরাসি সরকার পাকিস্তানকে মিরাজ ২০০০ বিমান বিক্রয় করবে। এর ফলে ফ্রান্সই লাভবান হবে। নিকট প্রাচ্য এবং দক্ষিণ এশিয়ার ভারপ্রাপ্ত মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের সহকারী সচিব টেরেসিটা স্যাফার উল্লেখ করেন, পাকিস্তানের ৩৫০টি জঙ্গী বিমান অকেজো হয়ে গেছে। এই বিমানের পরিবর্তে যদি নতুন বিমান দেওয়া না হয় তাহলে দক্ষিণ এশিয়ার সামরিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পাকিস্তানের পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে পড়বে। এর ফলে সৃষ্টি হবে অস্থিতিশীলতা। এফ-১৬ জঙ্গী বিমান সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেবার ফলে পাক-ভারত সম্পর্ক উন্নত হয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

উপরোক্ত ঘটনাবলী ছাড়াও ভারত-মার্কিন সম্পর্ক আরও অনেক ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। পাকিস্তানকে সামরিক জোটের অন্তর্ভুক্ত করার ফলে ভারত উপমহাদেশে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভরত-মার্কিন বোঝাপড়া হ্রাস পেয়েছে। জোট-নিরপেক্ষতা, আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসা, তৃতীয় বিশ্বের সমস্যা, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, উপনিবেশবাদ, নিরস্ত্রীকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উভয় দেশের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া, অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, রোডেশিয়া, নিকারাগুয়ার প্রশ্নে উভয় দেশের মতপার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আফগানিস্তান ও কাম্পুচিয়ার প্রশ্নেও উভয় দেশের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল। ভারত মহাসাগরে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি স্থাপন উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক পার্থক্যের ফলে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে তখন অসুবিধা ছিল। লিবিয়ায় মার্কিন আক্রমণ, জাম্বিয়া, জিম্বাবোয়ে ও বৎসওয়ানায় দক্ষিণ আফ্রিকার আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারত তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বি. আর. ভগত জোটনিরপেক্ষ দেশসমূহের এক প্রতিনিধি দলের নেতারূপে জেনারেল গদ্দাফির প্রতি সমর্থন জানান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল।

১৯৮৮-৮৯ সালের ভারত-মার্কিন সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে সরকারী ভাষ্য হোল, তৎকালীন পরিস্থিতির মধ্যে যে সব ইতিবাচক ধারা সৃষ্টি হয়েছিল তাদের সংহত রূপ দেওয়া হয়েছে। ১৯৮৭ সালে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মার্কিন সফরের সময়ে যেসব বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল তা কার্যকর করার চেষ্টা হয়েছে। এর ফলে অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক এবং প্রয়োগকৌশল স্থানান্তরের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে।[৫]

মার্কিন নেতাদের **ভারত সফর :** ভারত-মার্কিন সম্পর্কের উন্নতির একটি দিগ্-নির্দেশক রূপে উচ্চতর রাজনৈতিক পর্যায়ে দুই দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের মধ্যে মত বিনিময়কে বোঝায়। ১৯৮৮ সালের এপ্রিল মাসে মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব ফ্রাঙ্ক কারলুচি (Carlucci) ভারত সফর করেন। সেনা বাহিনীর প্রধান কার্ল-ই-ভুনো ভারতে আসেন। এছাড়াও সহকারী পররাষ্ট্র সচিব, প্রতিনিধি সভার এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় সাব-কমিটির চেয়ারম্যান ও অন্য দু-জন সদস্য আঞ্চলিক দ্বি-পাক্ষিক সমস্যা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী কে. নটবর সিং-এর সঙ্গে আলোচনা করেন। ১৯৮৮ সালে সেপ্টেম্বর/অক্টোবর মাসে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার অধিবেশনে যোগদানের জন্য নিউ ইয়র্ক যান। ঐ সময় তিনি রাষ্ট্রপতি রেগন এবং পররাষ্ট্র সচিব জর্জ শুলজ্-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং আলোচনা করেন।

প্রযুক্তির স্থানান্তরের জন্য ১৯৮৮-এর জানুয়ারি ও মার্চ এবং ১৯৮৯-এর জানুয়ারিতে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রযুক্তি স্থানান্তরের ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। ঐ সময়ে প্রত্যাশা করা হয়েছিল যে, ১৯৮৮ সালে উন্নত মানের প্রযুক্তি ও পণ্যের জন্য মার্কিন সরকার যে রপ্তানি লাইসেন্স দেবে তার পরিমাণ দাঁড়াবে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৮৮-এর অক্টোবর মাসে ক্রে একস্. এম. পি. সুপার কম্পিউটার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে সরবরাহ করে। মধ্যবর্তী পাল্লার আবহ বিষয়ে এই কম্পিউটারটি অত্যন্ত উপযোগী বলে বিবেচিত হয়েছে।

১৯৮৭ সালের অক্টোবরে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর কালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্যোগ (Science and Technology Initiative—STI) গ্রহণ করা হয়। ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত তার মেয়াদ ছিল। কিন্তু ১৯৮৮-৮৯ সালে তার মেয়াদ ১৯৯১-এর ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়। ১৯৮৮-৮৯ সালে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোল দ্বৈত কর-ব্যবস্থা বাতিলের জন্য একটি চুক্তি সম্পাদন।

১৯৮৯-৯০ সালের ভারত-মার্কিন সম্পর্কের দিক আলোচনা করলে দেখা যাবে যে দুটি দেশের সরকারই পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ়তর করার জন্য অগ্রসর হয়েছে। তত্ত্বগত-ভাবে বলা যায় যে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক এবং প্রতিরক্ষা বিষয়ক ক্ষেত্রে উভয় দেশের মধ্যে লেনদেন এবং যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৮৯ সালের জুন-জুলাই মাসে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কে. সি. পন্থ মার্কিন সফরে যান। তাঁর সঙ্গে সামরিক, বে-সামরিক প্রতিনিধি দলও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। প্রতিনিধি দল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলি পরিদর্শন করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের চেষ্টা করেন। এছাড়াও প্রতিরক্ষা সচিব চেনি এবং অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে পারস্পরিক স্বার্থ-সম্বলিত দ্বি-পাক্ষিক বিষয় নিয়েও আলোচনা করেন।

১৯৮৯-৯০ সালে মার্কিন প্রতিনিধি সভার এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় সাব-কমিটির চেয়ারম্যান স্টিফেন সোলার্জ, থিওডোর ওয়েইজ, চেস্টার অ্যাটকিন্স, টোনি হল এবং সেনেট সদস্য পি. ময়নিহান, ডাভে ডিউরেন বার্জার ভারত সফরকালে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী-সহ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক সমস্যা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

১৯৮৯-৯০ সালে মার্কিন কংগ্রেসে ভারত-বিরোধী কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ফলে উভয় দেশের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়। কংগ্রেস সদস্য ওয়ালি হার্জার ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন যে, পাঞ্জাবে ভারত সরকার মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে এবং ভারত সরকার অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল-এর মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে পাঞ্জাবে প্রবেশ করতে দেয়নি। ভারতকে সাহায্য বন্ধের জন্য ১৯৮৯-এর জুন মাসে প্রতিনিধি সভায় একটি প্রস্তাব পেশ করা হলে প্রস্তাবটি ২১২—২০৪ ভোটে পরাস্ত হয়।

১৯৮৯-এর নভেম্বর মাসে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব এম. কে. সিং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান। তিনি মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের অ্যান্ডার সেক্রেটারী রবার্ট কিমিটের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিরোধ মীমাংসা দক্ষিণ এশিয়ার সমস্যা, প্রতিরক্ষা, অর্থনৈতিক, বাণিজ্য, প্রযুক্তি স্থানান্তর, মাদক পাচার সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৯-৯০ সালে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে প্রযুক্তি স্থানান্তরই ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তবে ১৯৮৯-এর নভেম্বর মাসে ভারত 'অগ্নি' রকেট সাফল্যের সঙ্গে উৎক্ষেপণ করার পর মার্কিন কংগ্রেস তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে এবং ক্ষেপণাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত যন্ত্রাংশ সরবরাহ বন্ধ করারও দাবি ওঠে। বাঙ্গালোরের আবহবিদ্যাকেন্দ্রের জন্য একটি সুপার কম্পিউটর সরবরাহের বিষয় নিয়ে ভারত-মার্কিন আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৮৯-এর মে মাসে মার্কিন প্রশাসন ভারত, জাপান ও ব্রেজিল মেধাসত্ত্ব বিষয়ে মার্কিনী নির্দেশ না মানায় সুপার ৩০১ ধারা অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য হুমকি প্রদর্শন করে।

১৯৮৯-৯০ সালে মাদক দ্রব্যের বিপদ, অসামরিক বিমান পরিবহণ, ভারত-মার্কিন শিক্ষা কমিশন-এর সভা, উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি ইত্যাদিকে সম্পর্কের ইতিবাচক দিক বলা যায়। তবে রাষ্ট্রপতি বুশ ভারত সম্পর্কে কড়া মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের উগ্রপন্থীদের সমর্থনেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে বুশ প্রশাসন মতামত প্রকাশ করেছে।

১৯৯০-৯১ সালে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক যে খুব স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হয়েছে একথা বলা চলে না। তবে তৎকালীন ভারত সরকার উপসাগরীয় যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন জ্ঞাপন করেছে। ইরাকের উপর আক্রমণকারী বিমানকে ভারতের বিমান বন্দর থেকে জ্বালানী সরবরাহ করেছে। এ নিয়ে ভারত সরকারকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী ও উগ্রপন্থীদের সমর্থনের ব্যাপারে মার্কিন মনোভাবের কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

১৯৯১-৯২ সালের ভারত-মার্কিন সম্পর্ককে ঠাণ্ডা যুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়ের আন্তর্জাতিক রাজনীতির গুণগত পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট থেকে বিচার করাই সঙ্গত। ভারত-মার্কিন সম্পর্কের উপর এই নতুন পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে।

১৯৯১-১৯৯২ সালের ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ইতিবাচক দিকগুলি হোল : ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জেমস বেকারের দ্বি-পাক্ষিক ও বহু-পাক্ষিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা ; ড্যানিয়েল ময়নিহান, ল্যারি প্রেসলার, জেমস ম্যাকডারমট এবং মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি কার্লাহিলস-এর ভারত ভ্রমণ ; নিরাপত্তা পরিষদের শীর্ষ বৈঠকে ভারতের

প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশের সাক্ষাৎকার ; প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কারিগরীর ক্ষেত্রে ভারত-মার্কিন সহযোগিতা ; ১৯৯১ সালের এপ্রিল মাসে ভারতকে 'Priority Foreign Country' ঘোষণা ; প্রযুক্তির বিকাশে মার্কিন বিনিয়োগ ইত্যাদি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন, পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতন ভারতসহ সামগ্রিকভাবে নির্জোট আন্দোলনের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ নিয়ে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছিল। এর পর থেকে ভারত সরকারের মার্কিন ঘেঁষা নীতির অধ্যায় শুরু হয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতির বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে তাল রেখে ভারত সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করে। ভারতের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, মাথার উপর ঝুলন্ত গ্যাট-এর খাঁড়া ভারতকে মার্কিন-প্রীতির দিকে ঠেলে দেয়। ১৯৯১-এর নয়া-শিল্পনীতি, অর্থনৈতিক উদারনীতিকরণ, বিশ্বায়ন, বিদেশীদের কাছে ভারতের বাজার উন্মুক্ত করা, অবাধ বাণিজ্য নীতি গ্রহণ, ভরতুকি বন্ধের মার্কিন প্রস্তাব গ্রহণ, বিশ্বব্যাঙ্কের ও আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের নির্দেশনামার প্রতি ভারত সরকারের অকুণ্ঠ সমর্থন জাপন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের সন্তোষ বিধান করেছে। এর ফলে ভারত-মার্কিন বন্ধুত্বের ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়েছে।

অন্যান্য বছরের মতো ১৯৯২-৯৩ সালেও অনেক প্রভাবশালী মার্কিন নেতা ভারত সফরে এসেছেন। ৪২-তম রাষ্ট্রপতি রূপে বিল ক্লিন্টনের শপথ গ্রহণ ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যাপক গুণগত কোন পরিবর্তন আনেনি। গ্যাট চুক্তিতে স্বাক্ষর দান, মেধাস্বত্ব আইন মেনে চলা, ভারত থেকে আমদানিকৃত ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যের উপর থেকে সুবিধা দানের ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নেয়। ভারত সরকার মার্কিন পণ্যের ব্যাপক অনুপ্রবেশে অসম্মত হওয়ায় স্পেশ্যাল ৩০১নং ধারা অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের উপর একতরফা বাধা নিষেধ আরোপ করে। ১৯৯২ সালের মে মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দু-বছরের জন্য ভারতে মার্কিন বাণিজ্য ও প্রযুক্তি স্থানান্তরের উপর বাধা নিষেধ আরোপ করে। ভারতে অগ্নি ও পৃথ্বী রকেট উৎক্ষেপণ, এস. এল. ভি., এ. এস. এল. ভি, পি. এস. এল. ভি., জি. এস. এল. বি. কর্মসূচী মার্কিন প্রশাসনের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। এর ফলে রাশিয়ার উপর চাপ সৃষ্টি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে ক্রয়োজেনিক রকেট ইঞ্জিন সরবরাহে বাধা দেয়।

ভারত সরকার নিজে উদ্যোগী হয়ে নিরস্ত্রীকরণ, আণবিক অস্ত্রের সম্প্রসারণ রোধ ও পরস্পরের আস্থাঅর্জনের জন্য আলোচনা শুরুর চেষ্টা করে। কিন্তু পাক-প্রশিক্ষিত সন্ত্রাসবাদীদের কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ এবং ভারত সরকার কর্তৃক পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে।

১৯৯৩-৯৪ সালে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক কোনক্রমেই বন্ধুত্বপূর্ণ পথে অগ্রসর হয়নি। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সম্পর্কের উন্নতি ঘটলেও মানবাধিকার ও আণবিক অস্ত্রের সম্প্রসারণ রোধ চুক্তিতে স্বাক্ষর দানে ভারতের অস্বীকৃতিকে কেন্দ্র করে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এই সময়ে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যের উন্নতি ঘটেছে। মেধাস্বত্ব নিয়ে ভারত-মার্কিন বিরোধ অব্যাহত থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, ভারতের জন্য প্রযুক্তি স্থানান্তরের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপেই আণবিক অস্ত্রের সম্প্রসারণ রোধ চুক্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য হোল ভারতের আণবিক সামর্থ্য ধ্বংস করা। তবে ভারতের মতো পাকিস্তানের প্রতি মার্কিন প্রশাসন কঠোর মনোভাব দেখায়নি।

১৯৯৫ সালের মার্চ মাসে কোপেনহেগেন-এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব সামাজিক বিকাশ সম্পর্কিত শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য কয়েকটি দেশ কাশ্মীরের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি যুক্ত করার জন্য দাবি জানায়। কিন্তু ভারতের তৎপরতায় ঐ প্রয়াস ব্যর্থ হয়। জাতিপুঞ্জে ভারতের স্থায়ী ডেপুটি প্রতিনিধি কে. পি শ্রীনিবাসন উল্লেখ করেন যে, কোন সার্বভৌম রাষ্ট্রকে ভাঙার, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের অপব্যবহার করা উচিৎ নয়। [১১]

. ১৯৯৫-এর ১২-ই এপ্রিল ওয়াশিংটনে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিন্টন সফররতা পাক-প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর সঙ্গে এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, ভারত-পাকিস্তান সম্মত হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাশ্মীরের সমস্যা সমাধানের জন্য মধ্যস্থতা করতে প্রস্তুত। মার্কিন রাষ্ট্রপতি আরও ঘোষণা করেন যে, প্রেসলার সংশোধনীর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সমরসম্ভার সরবরাহ বন্ধ রেখেছিল। ঐ সংশোধনী পরিবর্তন করে পাকিস্তানকে সামরিক সম্ভার সরবরাহে তিনি রাজী আছেন। [১২]

. বর্তমানে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক অনেকটাই পাক-ভারত সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে অবশ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি মুখ্য ভূমিকা আছে। পাকিস্তানের প্রতি অন্ধ পৃষ্ঠপোষকতা এবং মার্কিন প্রচার মাধ্যম ও নেতৃবৃন্দের ভারত বিদ্বেষপ্রসূত মনোভাব এই সম্পর্কের অবনয়নে প্রত্যক্ষভাবে সহায়ক হয়েছে। পাকিস্তানের সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে মার্কিন মদত ভারত-পাক উপমহাদেশে অস্থিরতা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। ১৯৯৫ সালের ১৪-ই জানুয়ারি নতুন দিল্লিতে মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব উইলিয়াম পেরি মন্তব্য করেন যে, পাক-মার্কিন আটোসাটো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভারতের সহায়ক হবে। [১৩] তাঁর মতে, দক্ষিণ এশিয়ায় ঠাণ্ডাযুদ্ধের পরবর্তী বৈশিষ্ট্য সম্পর্ন সকল সমস্যাই পরিলক্ষিত হয়। পেরি স্পষ্টভাবে মন্তব্য করেন যে, দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করবে না। কাশ্মীরে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিষয়ে তিনি নিরুত্তর থাকেন। তাঁর মতে, কাশ্মীর সমস্যাই হোল ভারত-পাক বিরোধের মূল কারণ।

**ভারত-মার্কিন সম্পর্কের মূল্যায়ন (Evaluation of India-U.S. Relation) :** ভারত-মার্কিন সম্পর্ক ১৯৮৯ সালের পর থেকেই নতুন মোড় নিয়েছে। ভারত-পাক সমস্যা, ভারতে মানবাধিকার বিষয়ক সমস্যা, আণবিক অস্ত্রের সম্প্রসারণ বিরোধী চুক্তি ছাড়া অন্যান্য আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে ভারত-মার্কিন অংশীদারী মনোভাব দেখা যাচ্ছে। অতি সম্প্রতি ভারত-মার্কিন সম্পর্ক নতুন বাঁক নিয়েছে। বিরোধ থেকে বন্ধুত্বের দিকে উভয় দেশ অগ্রসর হচ্ছে। তবে অনেক বিশ্লেষক এই মনোভাব পোষণ করেন যে, ঠাণ্ডাযুদ্ধের অবসানের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ার দিকে, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার দিকে চোখ ফিরিয়েছে। এই অঞ্চলটিকে তার প্রভাবের এলাকায় পরিণত করতে চাইছে। ভারত এই অঞ্চলের প্রধান শক্তি। তাকে দুর্বল করাই মার্কিন সরকারের লক্ষ্য। এই কারণেই ভারতকে অস্থিতিশীল রাখাই কর্মসূচীগত দিক থেকে প্রাধান্য পেতে পারে। ভারত সরকারের অদূরদর্শী মার্কিন তোষণ নীতি এক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। অন্যদিকে নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদকে মার্কিন প্রশাসন সমর্থন জানাচ্ছে না। চীনের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বের পুনরুদ্ধার সম্পর্কে মার্কিন ভূ
আছে।

চীন-ভারত একত্র হোলে এশিয়ায় মার্কিন প্রভাব রুদ্ধ হবে। সুতরাং ভারতকে সন্তুষ্ট করে চীনের প্রভাব থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন রাখাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য।

বিগত কয়েক বছরের ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ধারার মাধ্যমে কয়েকটি সমস্যা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ১৯৯৫ সালের জানুয়ারি মাসে মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব উইলিয়াম পেরি যে ভারত সফর করেন, তার দুটি উদ্দেশ্য ছিল : উভয় দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা বিষয়ে সহযোগিতার ব্যবস্থা করা এবং আঞ্চলিক ক্ষেত্রে আণবিক অস্ত্রের সম্প্রসারণ রোধে ভারতকে সম্মত করা।

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হলেও আঞ্চলিক স্তরে আণবিক অস্ত্রের সম্প্রসারণ রোধে ভারত সম্মত হয়নি। ভারত সর্বপ্রথম পেন্টাগন এবং তার সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে সরাসরি সহযোগিতা প্রতিষ্ঠায় সম্মত হয়েছে। দুটি দেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রক্ষিত হবে। এর ফলে ভারত-মার্কিন সামরিক সম্পর্ক শক্তিশালী হবে বলে মার্কিন এবং ভারত সরকার মনে করে।

বস্তুতপক্ষে এযাবৎকাল ভারত-মার্কিন বোঝাপড়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং কূটনৈতিক পদ্ধতির মাধ্যমেই পরিচালিত হয়েছে। বিগত জানুয়ারি মাসের সামরিক চুক্তির পর তা এক গুরুত্বপূর্ণ সামরিক মাত্রা অর্জন করেছে। এর ফলে এতদিন ধরে পাক-ভারত উপমহাদেশে এককভাবে পেন্টাগন ও পাক সামরিক বাহিনীর মধ্যে যে দহরম-মহরম চলছিল তার অবসান ঘটল।

ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রটি এখন ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক ও সামরিক সহযোগিতাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠছে। কোন কোন বিশ্লেষক-এর মতে, এই ধারাটি ঠাণ্ডাযুদ্ধোত্তর প্রেক্ষাপটের একটি ব্যাপক অংশে পরিণত হয়েছে। ভারত-মার্কিন বোঝাপড়া দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিকে প্রভাবিত করবে। বর্তমানে চীন, মধ্য এশিয়া, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল ভারত-মার্কিন দৃশ্যপটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সমস্যার সংখ্যা বাড়ছে। উভয়দেশই এখন সমঝোতার দিকগুলি খতিয়ে দেখছে। পার্থক্যের এলাকা সীমিতকরণের দিকেই তাদের লক্ষ্য। মত-পার্থক্যের মধ্যেই কিভাবে ঐকমত্যে পৌঁছানো যায়, সেটাই দুটি দেশের আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় নিয়ে মতপার্থক্যের অবসান ঘটানো সম্ভব হয়নি।[১৪] ঐ তিনটি ক্ষেত্র হোল :

**প্রথমত**, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত-পাক আণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতা এবং কাশ্মীর সমস্যার সমাধান না হলে একটি আণবিক যুদ্ধের ভীতি সম্পর্কে আশঙ্কা বোধ করছে। বিগত দিনের ইতিহাস বিচার করলে অনুধাবন করা যাবে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বদাই পাকিস্তানকে সুরক্ষিত রাখার জন্য চেষ্টা করেছে। বৃহৎ শক্তির উচিত ছোট শক্তির প্রতি নরম মনোভাব অবলম্বন করা—এই যুক্তির অজুহাতে পাকিস্তানের সকল দাবি মেনে চলার জন্য ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে। ভারত সরকার মার্কিন নেতাদের এই মনোভাব গ্রহণ করেনি। পক্ষান্তরে, বলা হয়েছে যে, ভারত স্থিতাবস্থা বজায় রেখেছে। পাকিস্তান স্থিতাবস্থা ভেঙেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

উচিত কাশ্মীরে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ও অভিযান বন্ধের ব্যবস্থা করা। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোন পক্ষের দিকে ঝুঁকছে না বলে ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। নিকসন, কিসিঙ্গার, রেগন এবং বুশ প্রশাসনও পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকেছিল। ক্লিন্টন প্রশাসনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে বিবেচনা করছে না। কাশ্মীর প্রশ্ন নিয়ে ভারত কোন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করুক, কোন সামরিক সমাধানের দিকে যাক—এটা প্রতিরোধ করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এশিয়া নীতির অন্যতম পদক্ষেপ রূপে প্রাধান্য পেয়েছে। এই কারণেই ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের মতের অমিল রয়েছে। ১৯৯৪ সালে ভারত সফর কালে সহকারী মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব রবিন র‍্যাফেল কাশ্মীরের ভারত-চুক্তি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এখন এই বিষয় নিয়ে আলোচনা নানাস্তরে শুরু হলেও মতানৈক্য বজায় আছে।

দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আণবিক অস্ত্রের বিষয়টিকে একটি সমস্যা রূপে বিবেচনা করছে। ভারত আণবিক বোমা তৈরির ক্ষমতা অর্জনের পর এবং ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের দিকে অগ্রসর হওয়ায় ভারত-পাক সামরিক সামর্থ্যের হেরফের ঘটতে পারে বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আশঙ্কা প্রকাশ করছে। কিন্তু চীন এই ব্যাপারে আদৌ শঙ্কিত নয়।

অনেকের মতে, দক্ষিণ-এশিয়ার সামরিক প্রস্তুতি ও কৌশলের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনো উৎসাহ প্রকাশ করেনি। ভারত সরকার বুশ এবং ক্লিন্টন প্রশাসনকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সমস্যা আছে। জনগণকে দেশের প্রতিরক্ষার বিষয়ে অবহিত করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একদিকে আণবিক অস্ত্রের সম্প্রসারণ রোধ চুক্তিতে স্বাক্ষর দেবার জন্য ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করছে ; অন্যদিকে ভারতের স্বল্প-পাল্লার এবং মাঝারি-পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র যথাক্রমে পৃথ্বী এবং অগ্নি পাকিস্তান ও চীনের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারে বলে মার্কিন প্রশাসনের আশঙ্কা আছে। অগ্নি-কে আরও শক্তিশালী করার জন্য যদি ভারত উদ্যোগী হয় তাহলে ভারত মহাসাগরে মার্কিন ঘাঁটি নিশ্চিন্ত থাকবে কিনা, এই বিষয়ে মার্কিন প্রশাসন চিন্তা করছে।

তৃতীয়ত, ভারতের নৌ-বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি পাকিস্তানের নিরাপত্তা সম্পর্কে মার্কিন প্রশাসনকে চিন্তিত করে তুলেছে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে মার্কিন প্রশাসন ভারতের নৌ-বাহিনীর সামর্থ্যের প্রমাণ পেয়েছে। বঙ্গোপসাগরে চৈনিক নৌ-বাহিনীর উপস্থিতি এবং তা প্রতিরোধের বিষয়েও ভারত ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

বিশষজ্ঞদের মতে, অতীতের মতপার্থক্যের এই দিকগুলি বর্তমানে ভারত-মার্কিন সহমতের পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে। মার্কিন ও ভারতের প্রতিরক্ষা বিষয়ক চুক্তিই তার অকাট্য প্রমাণ।

১৯৯৫ সালের ২০শে মার্চ বোম্বাইতে একাদশতম স্যার ডোরাব টাটা স্মৃতি স্মারক বক্তৃতায় হেনরী কিসিঙ্গার বলেন যে ভারত-মার্কিন সংঘাতের কোন সম্ভাবনা নেই। "ঠাণ্ডাযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক নীতি" শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি বলেন যে নিকট ভবিষ্যতে ভারতের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংঘর্ষের সম্ভাবনা নেই। তবে ভারত সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করলে তা হতে পারে। তবে ভারতের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী হবার কথা চিন্তা করা যায় না।

সুতরাং চীন ও ভারতকে খুব সতর্কতার সঙ্গে তাদের সম্পর্কের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

## ভারতের পররাষ্ট্রনীতি (Foreign Policy of India) :

দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান শক্তিরূপে ভারত আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিজের স্থান করে নিয়েছে। ১৯৪৭ সালের পর থেকে একাদিক্রমে ভারত শুধু এশিয়া নয়, সমগ্র বিশ্বে নিজের প্রভাবের ছাপ ফেলেছে। নির্জোট আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা, আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে পঞ্চশীলের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ ভারতকে শান্তি প্রতিষ্ঠার এক স্থপতি রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নিরস্ত্রীকরণ, উপনিবেশবাদের নির্মূলীকরণ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সহ প্রতিটি আন্তর্জাতিক মঞ্চে তৃতীয় বিশ্বের দাবি, সমস্যা ও সত্তা তুলে ধরার ক্ষেত্রে ভারত অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। একদা তৃতীয় বিশ্বের নেতৃত্বে ভারত অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। ঠাণ্ডাযুদ্ধের ও দ্বি-মেরুপ্রবণ আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিলতার মধ্যে ভারত যে এক নেতৃত্ব প্রদানকারী শক্তি ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা, স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের আন্দোলন, উত্তর-দক্ষিণ আলোচনা, দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা, শান্তির জন্য আণবিক শক্তিকে প্রয়োগসহ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ভারতের ভূমিকা নিয়ে কোন সংশয় ছিল না।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বদলে গেছে। ঠাণ্ডাযুদ্ধ ও দ্বি-মেরুপ্রবণতা এখন স্মৃতিচিহ্ন রূপে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। তৃতীয় বিশ্ব ও নির্জোট আন্দোলনের মহান বন্ধু সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন, পূর্ব-ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতন এক নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ যাকে এক-মেরুপ্রবণ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা নামে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে গণ-সাধারণতন্ত্রী চীন বহুমেরুপ্রবণ আন্তর্জাতিক রাজনীতির পক্ষে কথা বলছে। গ্যাট চুক্তিতে স্বাক্ষরদান, বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার মূল সদস্যপদ গ্রহণ, জাতীয় অর্থনীতির ব্যাপক কাঠামোগত পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাস, নিজের অর্থনীতিকে বিদেশের হাত থেকে মুক্ত করা, বিশ্বের পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্গে নিজের অর্থনীতিকে যুক্ত করা বা অর্থনীতির বিশ্বায়ন ঘটানো, জাতীয় মিশ্র অর্থনীতিকে ব্যাপকভাবে বে-সরকারীকরণের দিকে ঠেলে দেওয়া দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়েছে। সমালোচকগণ উল্লেখ করে থাকেন যে বিদেশী পুঁজিপতিদের চাপে সরকার প্রয়োজনীয় পণ্যের উপর থেকে ভরতুকি প্রত্যাহার, প্রায় বিনাশর্তে বিদেশী লগ্নীকে অবাধ সুযোগদান, বৌদ্ধিক সম্পত্তি আইনে মুচলেকা দেওয়া প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দেশের সার্বভৌমিকতা ও স্বাতন্ত্র্যকে ক্ষুণ্ণ করেছে।

একথা ভুলে যাবার কোন সঙ্গত কারণ নেই যে দেশের অভ্যন্তরীণ নীতির এই পরিবর্তন পররাষ্ট্রনীতির উপর প্রভাব ফেলেছে। বহির্বিশ্বের দিকে ভারতকে তাকাতে হচ্ছে। সুতরাং দেশীয় পরিবেশের এই পরিবর্তন যে পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করবে তা বলাই বাহুল্য।

উপরন্তু ১৯৮০-এর মধ্যবর্তী সময় থেকে, বিশেষভাবে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব-ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে যে পরিবর্তন শুরু হয়েছিল, তার পরিণামও ভারতসহ তৃতীয় বিশ্বের কাছে শুভ বলে বিবেচিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে উপসাগরীয় যুদ্ধ, সোমালিয়া ও রুয়ান্ডার গৃহযুদ্ধ, পূর্বতন যুগোশ্লাভিয়ার বসনিয়া ও হার্জেগোভিনায় যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে তাতে সর্বত্রই মর্কিন প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে চীন-মার্কিন, জাপ-মার্কিন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে মনকষাকষি ও বাণিজ্য যুদ্ধ চলছে তার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

একক বিশ্বাধিপতিতে পরিণত হতে বাধা পাচ্ছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিবেশ এমন এক পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে চলেছে যেখানে ভারতসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি নানা চাপের কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য হচ্ছে বা ঐসব দেশের শাসকগোষ্ঠী নিজেদের নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে মানানসই করে তোলার জন্য স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছে। ফলে এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, জাতীয় স্বার্থে পুঁজিবাদী দেশগুলির শর্তের কাছে আত্ম বলিদান দেওয়া ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। এই ধারণাও সৃষ্টি হয়েছে যে, ভারত এখন নয়া-উপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে সামঝোতা করে নিজের ভেঙে পড়া অর্থনীতিকে তেজী করতে চাইছে। বিশ্বায়নের নামে নিজস্ব ও স্বতন্ত্র বিবেচনা শক্তিকে বর্জন করতে শুরু করেছে।

এই ধারণার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে অনেকে উপনীত হয়েছেন যে, ভারতের জোট-নিরপেক্ষতা এখন নিছক একটি তত্ত্বগত ধারণায় পরিণত হয়েছে। প্রকৃত অর্থে ভারতের জোট-নিরপেক্ষতার নীতি এখন জোট-পক্ষতার দিকে এগিয়ে চলেছে।

এই ধারণা নিয়ে অবশ্যই নানা অভিমত থাকতে পারে। একমাত্র ভারতের পররাষ্ট্রনীতির নানা দিক বিবেচনা করেই এই বিষয়ে মতামত দেওয়া সম্ভব।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি অন্যান্য দেশের মতোই ভৌগোলিক অবস্থান ও উপাদান, আয়তন, সীমান্তরেখা, সমুদ্রপথের নৈকট্য, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের ক্ষমতা, মনো ভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি, তাদের জোট-প্রতিজোট, ভারতের মৌল অঙ্গীকার, ইতিহাসও নিরাপত্তা-বিষয়ক ধারণা, অর্থনৈতিক বিকাশ, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামো, প্রাকৃতিক সম্পদ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশ, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল, স্বার্থ-গোষ্ঠী রাজনৈতিক নেতৃত্ব, জাতীয় স্বার্থ ও নৈতিকতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি তার ভৌগোলিক অবস্থানকে কেন্দ্র করেও আবর্তিত হয়েছে। ভারত বিশ্বের উত্তর গোলার্ধে এবং এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত। তার ভূখণ্ডের মোট আয়তন ৩,২৮০,৪৮৩ বর্গ-কিলোমিটার। সীমান্তরেখা ১৫,২০০, উপকূলরেখা ৫,৭০০ কিলোমিটার বিস্তৃত। ভারতের পূর্বে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর (আংশিকভাবে ভারত মহাসাগর) অবস্থিত। পশ্চিমে পাকিস্তান এবং উত্তরে চীন, নেপাল ও ভুটান অবস্থিত। পূর্বে অবস্থিত মিয়ানমার। বাংলাদেশও ভারতের পূর্বে অবস্থিত এবং মোটামুটিভাবে ভারত কর্তৃক পরিবেষ্টিত। ১৯৮১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ৬৮৫,১৮৪,৬৯২। তবে বিগত নয় বছরে লোকসংখ্যা পঁচাত্তর কোটির কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে।

জলবায়ু, ভাষা-সংস্কৃতি, সামাজিক আচার-আচরণ, জীবনধারা, ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার, অর্থনৈতিক, ও রাজনৈতিক জীবনের বিকাশ প্রভৃতির দিক থেকে বিচার করলে ভারতকে বৈচিত্র্য এবং বৈভবে সমৃদ্ধ এক মহান দেশরূপে উল্লেখ করা যায়। নানা জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের অবস্থানের ফলে ভারতের ঐতিহ্য ও সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছে। বিভেদের মধ্যে ঐক্যের স্মারক হোল ভারত। প্রকৃতির দিক থেকে ভারত একটি উপ-মহাদেশ।

ভারত প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রভূমি। সিন্ধুনদের অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা—সিন্ধু-সভ্যতা।

ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থান, অতীতের অভিজ্ঞতা, জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কে শাসক-রূপী মুষ্টিমেয় প্রাধান্যকারী ব্যক্তিদের ধারণা, মতাদর্শগত মতৈক্য, অর্থনৈতিক স্বার্থ ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হয়। তা ছাড়া দেশের অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক শক্তি-সাম্যের দ্বারাও পররাষ্ট্রনীতি প্রভাবিত হয়।[৩৫] ভারতের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি।

প্রত্যেক দেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও নির্ধারক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কয়েকটি মৌলিক লক্ষ্য ও নীতিকে কেন্দ্র করে পররাষ্ট্রনীতি গড়ে ওঠে। রাষ্ট্রীয় সংহতি রক্ষা, জাতীয় নিরাপত্তা বিধান, অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রসারসাধন, জাতীয় ক্ষমতা ও প্রাধান্য বৃদ্ধি, জাতীয় মর্যাদার প্রসার পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্যরূপে সাধারণভাবে বিবেচিত হয়।

পররাষ্ট্রনীতি বিভিন্ন উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাদের পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক বলে। পররাষ্ট্রনীতির মুখ্য নির্ধারক হোল ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যা, নৈতিকতা, অর্থনৈতিক সম্পদ, সামরিক সামর্থ্য, জাতীয় স্বার্থ, ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার, মতাদর্শ ও জাতীয় শক্তি এবং সামর্থ্য

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই জাতীয় নেতৃবৃন্দ স্বাধীন ভারতের সঙ্গে বহির্বিশ্বের ভবিষ্যৎ সম্পর্কের এক রূপরেখা অঙ্কন করেছিলেন। স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে নেহরুর নেতৃত্বে ভারত যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং শান্তির পক্ষে দৃঢ় শপথ গ্রহণ করেছিল। শুধু তাই নয় ; আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের উন্নতির জন্য নতুন দিল্লিতে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের সম্পর্কের মাধ্যমেই তার পররাষ্ট্রনীতির চরিত্র অনুধাবন করা সম্ভব। কিন্তু এই সম্পর্ক ভারতের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর দ্বারা প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য কোন সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। ভারতের স্বার্থের সঙ্গে অন্যান্য দেশের জনসাধারণের স্বার্থের সমন্বয়ের প্রেক্ষাপটে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হয়েছে।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য হোল জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, সংহতি এবং নিরাপত্তা রক্ষা, অন্য দেশের ক্ষতিসাধন না করে নিজের অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রসার, জাতীয় মর্যাদা রক্ষা করা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে আর্থিক সামর্থ্য অর্জন, বিশ্বশান্তি সংরক্ষণ, আণবিক যুদ্ধের প্রসার রোধ, শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে আণবিক শক্তির প্রয়োগ, নিরস্ত্রীকরণ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতার প্রসার সাধান, জোট-নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন, অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক সমস্যার সমাধান ইত্যাদি।[৩৬]

**ভারতের পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারকসমূহ (Determinants of India's Foreign Policy):** ভারতের পররাষ্ট্রনীতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত হয়। ঐ উপাদনসমূহকে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারকরূপে উল্লেখ করা যায়।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান নির্ধারকসমূহ হোল—ভারতের বিশ্বশান্তি এবং মৈত্রীর ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার, ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক সম্পদ, সামরিক

শক্তি, রাজনৈতিক মতাদর্শ, গণতান্ত্রিক সরকারী ব্যবস্থা এবং ভারতের জনসাধারণের নৈতিকতা প্রভৃতি।

কোন দেশ পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে তার ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করতে পারে না। সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারত বিভিন্ন দেশের সাথে শান্তিপূর্ণ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের নীতি গ্রহণ করেছে। বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে ভারত বিশ্ববাসীকে শান্তি ও মৈত্রীর ললিত বাণী উপহার দিয়েছে। অষ্টাদশ শতকে রাজা রামমোহন রায় বিশ্ব-মৈত্রীর বাণী প্রচার করেছিলেন। গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, জওহারলাল নেহরু বিশ্বশান্তি ও মৈত্রীর বিজয় পতাকা বহন করেছেন।

১৯৪৬ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তৎকালীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানরূপে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করেছিলেন যে, ভারত সম্পূর্ণরূপেই জোট-নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করবে। ১৯৪৭-এর ডিসেম্বর মাসে গণ-পরিষদে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বিশ্বশান্তি রক্ষা করাকে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির সর্বপ্রধান উপাদনরূপে উল্লেখ করেছিলেন।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি তার ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারের দ্বারাই নির্ধারিত হয়নি ; স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দ্বারাও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও ভারতের পররাষ্ট্রনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির দ্বি-মেরুপ্রবণতা, স্নায়ুযুদ্ধের প্রসার, আণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতা, বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং বিদ্বেষের পরিস্থিতির মধ্যে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি প্রণীত হয়েছিল। নতুন পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতার ফলে ভারতকে সামরিক জোট-বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করতে হয়েছিল। তা ছাড়া আফ্রিকা, এশিয়ার দেশসমূহের সাথে তার পূর্ববর্তী যোগাযোগ, ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের অভিজ্ঞতা, সাম্রাজ্যবাদ এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস ভারতকে সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ, নয়া-উপনিবেশিকতাবাদ এবং বর্ণ-বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে অতন্দ্র প্রহরীতে রূপান্তরিত করেছিল। ঐ নীতির যুক্তিসঙ্গত পরিণতি হোল জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের প্রতি দ্বিধাহীন সমর্থন এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ। ভারত প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার ভূমিকা পালনে উদ্যোগী হয়েছিল। ১৯৪৯ সালে গণ-পরিষদে জওহরলাল নেহরু উল্লেখ করেছিলেন যে, ভারত বিভিন্ন ধারা এবং শক্তির সমাবেশ কেন্দ্র এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে। সুতরাং স্বাধীনতার পরবর্তী অভিজ্ঞতা ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম নির্ধারকে পরিণত হয়েছিল।

ভারতের ভৌগোলিক অবস্থানও তার পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম নির্ধারকে পরিণত হয়েছে। জওহরলাল নেহরু নিজেই পররাষ্ট্রনীতির উপর ভৌগোলিক উপাদানের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল, মধ্যপ্রাচ্য এবং ভারত মহাসাগরের সমীপবর্তী অঞ্চলে যে ঘটনাবলী সংঘটিত হবে ভারত তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারে না। পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, আফগানিস্তান, চীনসহ দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের অভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রনীতির প্রতিক্রিয়া থেকে ভারত নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে না। এই কারণেই এই অঞ্চলে কোন যুদ্ধ, বিদেশী হস্তক্ষেপ অথবা অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে ভারতকে সঙ্গতি বিধানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। মধ্যপ্রাচ্য, পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল এবং ভারত মহাসাগরের নিকটবর্তী দেশসমূহের সামরিক গুরুত্বও ভারত অবহেলা করতে পারে না।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতির উপর ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার, ভৌগোলিক উপাদান এবং অতীতের অভিজ্ঞতার অবদানের উপর অধ্যাপক ভি. পি. দত্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি কেবল কয়েকটি নীতির দ্বারাই নির্ধারিত হয়নি। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের দ্বারাও ঐ নীতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হোল অর্থনৈতিক স্বার্থসহ জাতীয় স্বার্থের প্রসার।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতের অন্যতম লক্ষ্য ছিল দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ব্যবস্থা গ্রহণ। দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন ছিল বৈদেশিক সাহায্য এবং ঋণ। ঐ সাহায্য ছাড়া শিল্পায়নের কর্মসূচী রূপায়ণ সম্ভব ছিল না। ভারত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মিশ্র অর্থনীতির নীতি গ্রহণ করেছে। পুঁজিবাদী দেশসমূহ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রসারের জন্য সাহায্য দানে অনিচ্ছুক ছিল। তা ছাড়া ভারতের অর্থনৈতিক নীতি সম্পর্কে পুঁজিবাদী দেশসমূহের মধ্যে বিভ্রান্তির অবকাশ ছিল। এই কারণেই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতকে সাবেক সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সাথে অর্থনৈতিক সহযোগিতার পথ গ্রহণ করতে হয়েছিল। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের পক্ষে ভারতের সকল আর্থিক দাবি পূরণ করা সম্ভব ছিল না। এই কারণেই পুঁজিবাদী দেশসমূহের নিকট থেকেও ভারতকে সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে।

অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণ উপলব্ধি করেছিলেন যে, উন্নয়নশীল দেশরূপে এককভাবে নিজের অর্থনৈতিক স্বার্থ পরিপূরণ এবং সংরক্ষণ সম্ভব নয়। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এশিয়া এবং আফ্রিকার অন্যান্য দেশের অর্থনৈতিক এবং সার্বিক উন্নয়নের সমস্যার সাথে ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার অনেক সাদৃশ্য আছে। সেইজন্যই এশিয়া, আফ্রিকাসহ পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের সাথে ভারত অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক আদান-প্রদান ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। এই কারণেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অভ্যন্তরে ৭৭টি রাষ্ট্রের জোট গঠনে ভারত উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আর একটি বিশিষ্ট উপাদান হোল রাজনৈতিক মতবাদ। ভারত রাজনৈতিক দিক থেকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র অথবা পুঁজিবাদকে এককভাবে গ্রহণ করেনি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় ভারত সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের নীতি গ্রহণ করেছিল। পরবর্তীকালে রাষ্ট্র কর্তৃত্ব গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার নীতি গ্রহণ করেছে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ এবং বেসরকারী উদ্যোগের সমন্বয়ে গঠিত ভারতের অর্থনীতি পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের নিকটেও যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, গণতান্ত্রিক সমাজবাদের নীতি ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দাবিরও প্রতিফলন। এর মাধ্যমে একদিকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি এবং অন্যদিকে বেসরকারী উদোগের প্রবক্তাদের দাবির মধ্যে সমন্বয়সাধন সম্ভব হয়েছে।

ভারতের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা, দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষা ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মধ্যস্থাতার ভূমিকা পালনের উদ্যোগ পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করেছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভারতের পররাষ্ট্রনীতি এককভাবে কোন উপাদানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়নি। ভারতের ইতিহাসে, অতীতের অভিজ্ঞতা, সাম্প্রতিক কালের ঘটনাবলী, ভারতের

ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক ও জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় নিরাপত্তা প্রভৃতি উপাদানের দ্বারা ভারতের পররাষ্ট্রনীতির গতি প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। কোন কোন পরিস্থিতিতে বিশেষ উপাদান অসামান্য প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আবার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে একাধিক উপাদান বা নির্ধারক প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।

অধ্যাপক ভি. পি. দত্ত ভারতের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে পাঁচটি সমান্তরাল দৃষ্টিকোণের বিষয় উল্লেখ করেছেন। তিনি ভারতের পররাষ্ট্রনীতিকে পঞ্চমাত্রাবিশিষ্ট পররাষ্ট্রনীতি (Five Dimensional Foreign Policy) নামে অভিহিত করেছেন। **প্রথমত**, ভারত স্ব-নির্ভরশীলতার নীতি রূপায়ণে স্বাধীনতার পর থেকেই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কৃষিতে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ভারী শিল্প স্থাপনসহ শিল্পের ভিত্তির প্রসার অর্থনৈতিক নীতি রূপায়ণের মুখ্য উদ্দেশ্যে পরিণত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় যথাক্রমে শিল্প এবং কৃষির উন্নতিবিধান এবং বিকাশের জন্য উভয় দেশের নিকট থেকে সাহায্য গৃহীত হয়েছে। এই আত্মনির্ভরশীলতার নীতি উভয় শিবির থেকে সম-দূরত্বের নীতি গ্রহণের ভিত্তি প্রস্তুত করেছে।

**দ্বিতীয়ত**, বিদেশী প্রযুক্ত আমদানি এবং বিদেশী বিনিয়োগে উৎসাহদান পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিল। এমনকি প্রযুক্তিগত বিকাশের জন্য বহু-জাতিক সংস্থাকেও শিল্প প্রতিষ্ঠার নানাবিধ সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।

**তৃতীয়ত**, তৃতীয় বিশ্বভুক্ত দেশসমূহের সঙ্গে ভারত সম্পর্কের উন্নতি বিধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জওহরলাল নেহরু থেকে শুরু করে সকল প্রধানমন্ত্রীই জোট-নিরপেক্ষ ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের সাথে বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা প্রসারে সচেষ্ট ছিলেন। আফ্রিকা এবং আরব রাষ্ট্রসমূহের সাথে ভারত বিশেষ সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব স্থাপনে উৎসাহ প্রকাশ করেছে।

**চতুর্থত**, প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন ভারতের নিরপত্তা, শান্তিপূর্ণ নীতির রূপায়ণ প্রভৃতি সামগ্রিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। এই কারণে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন ভারতের পররাষ্ট্রনীতির কেন্দ্রীয় উপাদানে পরিণত হয়েছে।

**পঞ্চমত**, বহুদিন ধরে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা হোল সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সাথে উত্তরোত্তর বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন। নৈতিক, বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে ভারতের শান্তি এবং মৈত্রীর সম্পর্ক শক্তিশালী হয়েছে।

উপরোক্ত পাঁচটি দৃষ্টিকোণের মধ্যে সকল দৃষ্টিকোণ বা মাত্রা সর্বদা সমগুরুত্ব অর্জন করেনি। কিন্তু কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ মাত্রা বা দৃষ্টিকোণ গুরুত্ব অর্জন করেছে।

**ভারতের পররাষ্ট্রনীতি ঃ মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ (Foreign Policy of India ঃ Main Features) ঃ** আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারত একটি প্রভাবশালী দেশ। জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন বা তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম নেতা হিসেবে ভারত প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি তার স্বীকৃত রাজনৈতিক মূল্যবোধেরই প্রতিফলন। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত বিভিন্ন মনীষী শান্তি, সৌভ্রাতৃত্ব এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির

বাণী প্রচার করেছেন। ভারতের সংবিধানেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। রাষ্ট্রীয় কর্মপন্থা-নির্দেশক নীতির মধ্যে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক বিরোধের অবসানে ভারত শান্তিপূর্ণ পন্থা অবলম্বন এবং পারস্পরিক সহযোগিতার নীতিতে বিশ্বাসী। যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তপূর্ণ পথে সকল বিরোধের সীমাংসা করা, অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সকল সমস্যা সুষ্ঠুভাবে সমাধানের উপর ভিত্তি করেই ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মূল স্রোতোধারা প্রবাহিত।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে তুলে ধরেছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন, ভারত কোন শক্তিজোটে যোগদান করবে না। বিশ্বব্যাপী ক্ষমতা লাভের প্রতিযোগিতা থেকে সে দূরে থাকবে এবং নিজের শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার জন্য সচেষ্ট থাকবে।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তার মুখ্য বৈশিষ্ট্য হোল জোট-নিরপেক্ষতা, পঞ্চশীল, উপনিবেশিকতা এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সকল বিরোধের মীমাংসা, তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি সাধন যুদ্ধ ও আগ্রাসনের বিরোধিতা, নিরস্ত্রীকরণ, বিশ্বশান্তি বজায় রাখার জন্য নিরন্তর প্রয়াস, জাতি ও বর্ণবিদ্বষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, মানবকল্যাণে আণবিক শক্তি প্রয়োগ ইত্যাদি।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুই ছিলেন ভারতের পররাষ্ট্রনীতির জনক। তিনিই নির্জোট আন্দোলন এবং জোট-নিরপেক্ষতার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রবক্তা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন, ভারত কোন শক্তিজোটে অংশগ্রহণ করবে না। বিশ্বব্যাপী ক্ষমতালাভের প্রতিযোগিতা থেকে ভারত দূরে থাকবে। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য সচেষ্ট থাকবে।

জোট-নিরপেক্ষতা ভারতের পররাষ্ট্রনীতির স্তম্ভ-বিশেষ। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকেই ভারত নিরবিচ্ছিন্নভাবে এই নীতি অনুসরণ করেছে। বিশ্বশান্তি এবং নিরাপত্তার স্বার্থে ভারত সর্বদাই আন্তর্জাতিক রাজনীতির সামরিকীকরণ, সামরিক জোট গঠন, বিদেশে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন প্রভৃতির বিরোধিতা করেছে। নিজের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য অন্য রাষ্ট্রের নিকট থেকে বিনা শর্তে সামরিক সাহায্য গ্রহণ এবং অস্ত্র ক্রয় করেছে। নিছক আত্মরক্ষার জন্যই ঐ অস্ত্র সংগ্রহ। ভারত ন্যাটো, সিয়াটো বা সেন্টো সামরিক জোটসমূহের বিরোধিতা করেছে। কারণ, ঐ জোটসমূহ ছিল আক্রমণাত্মক, ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যম ও হাতিয়ার। ঐ সব সামরিক জোট আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে।

**জোট-নিরপেক্ষতা :** জোট-নিরপেক্ষতার নীতি ভারতের নিকট কোন নেতিবাচক নীতি নয়। জোট-নিরপেক্ষতা আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখা অথবা আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখার অবস্থাকে বোঝায় না। ভারত জোট নিরপেক্ষতা বলতে নিছক নিরপেক্ষ থাকার নীতিকে বোঝায় নি। নেহরু উল্লেখ করেছিলেন, যেখানে স্বাধীনতা বিপন্ন অথবা ন্যায়নীতি আক্রান্ত অথবা যেখানে আগ্রসন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে আমরা নিরপেক্ষ থাকতে পারি না এবং নিরপেক্ষ থাকবও না।

এই কারণে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা যায়, নিরপেক্ষতা কোন দুষ্পরিবর্তনীয় গতিহীন ধারণা নয়। ১৯৪৯ সালে নেহরু স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন, আমরা যথাসম্ভব গোষ্ঠীগত ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করব। আমরা বিশ্বাস করি শান্তি এবং স্বাধীনতার অস্বীকৃতি অন্যত্রও স্বাধীনতাকে বিপদাপন্ন করবে। এর ফলে সৃষ্টি হবে সংঘর্ষ ও যুদ্ধ। নেহরু স্পষ্টভাবে উপনিবেশিক শাসন থেকে সকল দেশ ও জাতির মুক্তি এবং সমান সুযোগ-সুবিধার দাবির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন।

ভারতের জোট-নিরপেক্ষতার নীতি কোন সুবিধাবাদ নয়। জোট-নিরপেক্ষতা বলতে সমাজতান্ত্রিক এবং পুঁজিবাদী জোট থেকে সমদূরত্ব বজায় রাখার নীতিকে বোঝায় না। জোট-নিরপেক্ষতা আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন থেকে বিরতি অথবা বিচ্ছিন্নতার নীতিকে বোঝায় না। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির রূপকারগণ স্পষ্টতই অনুভব করেছিলেন বর্তমান বিশ্বে ভারতের পক্ষে বিচ্ছিন্নতার নীতি অনুসরণ করা সম্ভব নয়। অন্য জাতি থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখা সম্ভব নয়। নেহরু যথার্থই উল্লেখ করেছিলেন, আমাদের অবশ্যই সহযোগিতার পথ অনুসরণ করতে হবে অথবা আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। এর মধ্যবর্তী কোন পথ নেই।

জোট-নিরপেক্ষতার নীতির মাধ্যমে ভারত যুদ্ধ, সামরিকতা, আগ্রাসন, হস্তক্ষেপ, উপনিবেশিকতা, নয়া-উপনিবেশিকতা, আণবিক অস্ত্র উৎপাদন, সামরিক ঘাঁটি স্থাপন প্রভৃতির বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ভারত কোরিয়া যুদ্ধে মার্কিন নীতির নিন্দা করেছে। মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকায় জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের প্রতি যেমন দ্বিধাহীন সমর্থন জ্ঞাপন করেছে, ঠিক তেমনিভাবে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের আগ্রাসী নীতি ও ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করেছে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে ভারত অনেক বৃহৎ রাষ্ট্রের সমালোচনা ও বিরোধিতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। কোন শক্তিজোটের অন্তর্ভুক্ত না হয়েও ভারত আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষা, যুদ্ধ প্রতিরোধ এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিজের বাধ্যবাধকতা যথাযথভাবে পালনের প্রতি অঙ্গীকার থেকে ফিরে আসেনি। ভারত কোন আন্তর্জাতিক বিরোধ অথবা সমস্যা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখেনি। কোরিয়া ও ভিয়েতনাম যুদ্ধ, কঙ্গো-সংকট, আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ, ইরাক-ইরান যুদ্ধ তার প্রমাণ। বৃহৎ শক্তি, এমনকি কোন মহাশক্তিধর রাষ্ট্র সম্পর্কে তার মতামত বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছে।

তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী নেতা ও প্রবক্তারূপে জাতিপুঞ্জের অভ্যন্তরসহ যে কোন আন্তর্জাতিক মঞ্চ, সম্মেলন এবং শীর্ষ বৈঠকে অনুন্নত দেশসমূহের মধ্যে সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা সৃষ্টি এবং তাদের স্বার্থ-বিরোধী সকল প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেছে।

সুতরাং ভারতের জোট-নিরপেক্ষতা বিচ্ছিন্নতার নীতি নয়। জোট-নিরপেক্ষতা একটি অঙ্গীকার বিশেষ। এই নিরপেক্ষতা হোল কোন শক্তিজোটের না হয়ে আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে নিজের বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাবে পেশ করা। শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং যুদ্ধ, উপনিবেশিক শাসন এবং আগ্রাসনের বিলোপসাধনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের নীতি অনুসরণ। এই নীতি সমদূরত্বের নীতি নয়। কারণ, ভারত প্রতিটি জোটভুক্ত দেশের সাথে বিনাশর্তে অর্থনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি আদান-প্রদানের নীতি অনুসরণ করেছে।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতিকে 'গতিশীল নিরপেক্ষতা' বলাই সঠিক হবে। গতিশীল নিরপেক্ষতা বলতে শক্তি-কেন্দ্রিক বিশ্ব-রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার নীতিকে বোঝায়। নেহরুর ভাষায়, আমাদের নীতি নিরপেক্ষতার নীতি নয়। আমাদের নীতি হোল সক্রিয়ভাবে বিশ্বশান্তি রক্ষা এবং সম্ভব হলে তাকে শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি ভারতের নাগরিকদের দ্বারাও সমর্থিত হয়েছে। জোট-নিরপেক্ষতা তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ সৃষ্টি করেছে। বিশ্বের দরবারে ভারতকে উপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে। দীর্ঘ ৪২ বছরে কোন বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া এই জোট-নিরপেক্ষতার নীতি সম্পর্কে কোন বিতর্কের সৃষ্টি হয়নি। পররাষ্ট্রনীতি দেশের অভ্যন্তরীণ নীতির মত বিতর্কের উৎসে পরিণত হয়নি। জোট নিরপেক্ষতা ভারতের পররাষ্ট্রনীতির কাঠামোয় পরিণত হয়েছে।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তিরূপে পঞ্চশীলের নাম উল্লেখ করা যায়। পাঁচটি নীতি হোল ঃ অন্যের ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, অন্যের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করা, সমতা ও পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষা করা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। এই নীতির ভিত্তিতেই ভারত অন্যান্য দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানসহ পঞ্চশীলের নীতিসমূহ জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রধান ভিত্তিগত উপাদান ও বৈশিষ্ট্য। ১৯৫৪ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আবাদী অধিবেশনে জওহরলাল নেহরু উল্লেখ করেছিলেন—" কংগ্রেস বিশ্বাস করে যে, প্রতিবেশী দেশসমূহের শান্তিপূর্ণ বন্ধুত্ব সুলভ এবং বিশ্বের সকল দেশের সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে প্রকৃত শান্তি অর্জন করা সম্ভব।" কোন্ কোন্ নীতির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালিত হবে তা ভারত, চীন, মিয়ানমার, ইন্দোনেশিয়া এবং সম্প্রতি ভারত ও যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে যৌথ বিবৃতিতে তা সংযোজিত হয়েছে। কংগ্রেস আন্তরিকতার সঙ্গে পঞ্চশীলকে অভিনন্দন জানায়।

১৯৫৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং চীনের প্রধানমন্ত্রী ঝৌ এন লাই পঞ্চশীলের নীতিসমূহের বিন্যাস করেছিলেন। বান্দুং সম্মেলন, আফ্রো-এশীয় সম্মেলন, নিজোটি দেশসমূহের সম্মেলন, কোন আন্তর্জাতিক দ্বি-পাক্ষিক সম্মেলন, জাতিপুঞ্জ সর্বত্রই ভারত পঞ্চশীলের প্রতি অঙ্গীকার ঘোষণা করেছে।

**বর্ণ বৈষম্যের বিরোধিতা ঃ** ভারতের পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্যরূপে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশিকতা এবং নয়া উপনিবেশিকতা এবং বর্ণবিদ্বেষের বিরোধিতার নীতির উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজন। ভারত দীর্ঘকাল উপনিবেশিক এবং সাম্রাজ্যবাদী, শাসন ও শোষণের অধীন ছিল। সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা বিশ্বের সর্বত্রই নিজেদের প্রাধান্য এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা বিশ্বের সর্বত্রই নিজেদের প্রাধান্য এবং প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য শোষিত জাতির মধ্যে হীনমন্যতার মনোভাব সৃষ্টি করে। জাতি ও বর্ণের অজুহাতে শোষিত ও শাসিত মানুষকে শাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার চেষ্টা করে। ভারত বর্ণ ও জাতিগত বিদ্বেষের বিরোধী। এই বিরোধ শুধু তত্ত্বগত নয়। দক্ষিণ আফ্রিকা, প্রাক্তন দক্ষিণ রোডেশিয়ার মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গ শাসকদের বর্ণ-বিদ্বেষী নীতির বিরুদ্ধে আফ্রিকার বঞ্চিত মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেছে। জাতিপুঞ্জ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার

বহির্জগতে ভারতের ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে আছে। নিজেটি আন্দোলন, কমনওয়েলথ সম্মেলন এবং জাতিপুঞ্জে ভারত বর্ণ-বিদ্বেষ অবসানের বিষয়ে সক্রিয়তা এবং আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

**সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা ঃ** সাম্রাজ্যবাদের প্রতি ভারতের বিরোধিতা অত্যন্ত স্পষ্ট। এই কারণেই বিশ্বের সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের অবসানকল্পে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনে কখনও সে দ্বিধাগ্রস্থ হয়নি। এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের প্রতি ভারতের সহানুভূতিশীল মনোভাব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশের কোন অবকাশ নেই। কোরিয়া, ভিয়েতনাম, মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ, আফ্রিকার দেশসমূহের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন, জাতীয় সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা এবং আগ্রসন প্রতিরোধে ভারত অতন্দ্র প্রহরীর মতো সমর্থন ও সাহায্য করেছে। নিকারাগুয়া, এল সালভাডোর, ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ, পানামায় বহিঃরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে নিন্দা করেছে। পি. এল.ও-র নেতৃত্বে প্যালেস্তানীয় রাষ্ট্র গঠনের দাবি ভারত সমর্থন করেছে। আরাফত কর্তৃক স্বাধীন প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে। দিল্লিতে প্যালেস্তাইন মিশন স্থাপনের অনুমতি পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

**নয়া-উপনিবেশবাদের বিরোধিতা ঃ** সাম্রাজ্যবাদের নতুন রূপ হোল নয়া-উপনিবেশিকতা। আগ্রসন, সামরিক জোটগঠন, সামরিক ঘাঁটি স্থাপন, শর্তাধীন অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ, অস্থিতিশীলতা, সৃষ্টি, নাশকতামূলক ক্রিয়াকলাপে উৎসাহ প্রদান, সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ, অসম বাণিজ্য-চুক্তি, আন্তর্জাতিক বাজারে দরিদ্র দেশসমূহের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি পন্থার সাহায্যে নয়া-উপনিবেশিক শক্তি অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহই নয়া-উপনিবেশের আক্রমণ ও আগ্রসনের নিশানায় পরিণত হয়েছে। ভারত নিজেটি আন্দোলন, শীর্ষ-বৈঠক এবং জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের বিরুদ্ধে উন্নত দেশসমূহের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে উত্তর-দক্ষিণ বৈঠকে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছে। ভারত উত্তর-দক্ষিণ আলোচনা ও সংহতির পক্ষে। নতুন আন্তর্জাতিক অর্থ-ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক তথ্য-ব্যবস্থা, ৭৭টি দেশের জোটগঠন, সার্ক-স্থাপন, আফ্রিকা তহবিল গঠন সর্বত্রই ভারতের ভূমিকা ছিল অগ্রণী।

ভারত উপনিবেশিক শাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল অঞ্চলকে মুক্ত করার আন্দোলনের শরিকে পরিণত হয়েছে। পর্তুগীজ অধিকৃত গোয়া, দমন এবং দিউতে উপনিবেশিক শাসনের অবসানকল্পে অনেক পশ্চিমী দেশের ভীতি প্রদর্শনকে উপেক্ষা করে ১৯৬২ সালে পুলিশী-ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। নামিবিয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের দখলদারীর অবসানের জন্য সোয়াপোর নেতা নুজোমার নেতৃতে পরিচালিত আন্দোলনকে ভারত সমর্থন করেছে।

**জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন ঃ** মুক্তি-আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ছিল সর্বদাই ইতিবাচক। বিশ্বের এমন কোন মুক্তি-আন্দোলন নেই যার প্রতি ভারতের সমর্থন ছিল না। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন, ঘানা, উগান্ডা, দক্ষিণ রোডেশিয়া, অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক প্রভৃতি দেশে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বিদ্বেষী সরকারের বিরুদ্ধে নির্যাতিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রতি ভারতের সহযোগিতা সর্বজনবিদিত। ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি, সুয়েজখালের ব্যাপারে ইঙ্গ-ফরাসি মনোভাব, আলজিরিয়ায় ফ্রান্সের উপনিবেশিক

কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ভারত সর্বদাই সরব ছিল। এই সমর্থন কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। উপনিবেশিকতা এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নীতির সঙ্গে এই সহযোগিতা সম্পূর্ণরূপেই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

**যুদ্ধ ও শান্তি ঃ** যুদ্ধ এবং শান্তির প্রশ্নে ভারত সর্বদাই যুদ্ধের বিপক্ষে মত ব্যক্ত করেছে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সকল প্রকার আন্তর্জাতিক বিরোধ এবং সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কোরিয়াসহ ইন্দোচীনের যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যে আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ, এবং সম্প্রতি ইরাক-ইরান যুদ্ধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় ভারত সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছে। যুদ্ধ পরিহার করার অর্থ এই নয় যে, আত্মরক্ষার জন্য কোন দেশ যুদ্ধের পথ অবলম্বন করবে না। আত্মরক্ষার জন্য এবং কোন দেশের আগ্রাসী ও সম্প্রসারণবাদী কার্যকলাপ প্রতিরোধে যুদ্ধ অপরিহার্য হলে ভারত তাকে সমর্থন করেছে। এমন দৃষ্টান্ত তার নিজের ক্ষেত্রেই ঘটেছে। ১৯৪৭ সালে কাশ্মীরে পাক হানাদারদের প্রতিরোধকল্পে ভারতকে পাকিস্তানের সঙ্গে আংশিক যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছিল। তা ছাড়া ১৯৬৫ এবং ১৯৭১ সালেও পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধ বর্জন এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ-মীমাংসার অর্থ এই নয় যে, আত্মরক্ষার্থেও যুদ্ধ করা চলবে না।

শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারত সীমান্ত-সমস্যাসহ অন্যান্য সমস্যা সমাধানে আগ্রহশীল। চীনের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত-বিরোধ থাকলেও উভয় দেশ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই বিরোধ-মীমাংসার জন্যও চেষ্টা চলছে। পাকিস্তানের সঙ্গে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য সে আগ্রহী। ১৯৭১ সালে সিমলা-চুক্তি উভয় দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন এবং পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ-মীমাংসার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

**নিরস্ত্রীকরণ ঃ** ভারত আণবিক মারণাস্ত্র উৎপাদন এবং যুদ্ধ-প্রস্তুতির জন্য আণবিক শক্তিকে ব্যবহারের বিরুদ্ধে। জওহরলাল নেহরু থেকে শুরু করে ইন্দিরা গান্ধী পর্যন্ত সকল প্রধানমন্ত্রীই আণবিক বোমা উৎপাদনের বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করেছেন। শান্তির উদ্দেশ্যে আণবিক শক্তিকে ব্যবহার করাই ভারতের উদ্দেশ্য। এই কারণেই ১৯৭৪ সালে রাজস্থানের পোখরানে সফল আণবিক বিস্ফারণের পরও ভারত আণবিক বোমা উৎপাদনে এখনও পর্যন্ত কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ভারতের মূলনীতি হোল মারাত্মক অস্ত্র উৎপাদনের প্রতিযোগিতা থেকে বিরত থাকা, নিরস্ত্রীকরণের জন্য প্রয়াস চালানো এবং আণবিক মারণাস্ত্রের প্রসার রোধ। কার্যকর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্য অর্জনের অনুকূলে ভারত বার বার মত প্রকাশ করেছে। ভারত পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার বিরোধী। প্রধানমন্ত্রী নেহরু ১৯৬৪ সালে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার কাছে আবেদন করেছিলেন। ১৯৬১ সালে অন্যান্য জোট-নিরপেক্ষ দেশের সঙ্গে ভারত সাধারণ সভায় পারমাণবিক অস্ত্র নির্মূল করার আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল। এই প্রস্তাবে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারকে মানবজাতির বিরুদ্ধে অপরাধ এবং জাতিপুঞ্জের সনদ লঙ্ঘন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারত রাসায়নিক অস্ত্র-সমেত অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রের বিরুদ্ধেও মত প্রকাশ করেছে। ভারত আক্রমণাত্মক প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলারও বিরোধী। পাকিস্তানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

সকল দল ও মতের ঐকাবদ্ধ নির্দেশ ভারত সরকারকে ভবিষ্যতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে। ক্লিন্টন ভারত সফরকালে ভারত-পাক সীমান্তের নিয়ন্ত্রণ রেখার মর্যাদা পালন করিতে ও আলোচনার মারফতে সীমান্ত ও কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করিবার জন্য উভয় দেশের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছিলেন। শেষোক্ত বিষয়ে ক্লিন্টন বিশেষতঃ পাক শাসকদের সংযম প্রদর্শন করিতে ও সংঘর্ষের পথ ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন।

ক্লিন্টনের ভারত সফরের মারফতে ভারত মার্কিন সম্পর্কের উন্নতি হয়। তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি, আর্থিক ক্ষেত্রে ভারতের বিশ্বায়নের পথে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ, মার্কিন বাণিজ্যের প্রসার ও মার্কিন বিনিয়োগের সম্ভাবনা ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছিল। ভারত সফরকালে বিশে মার্চ দুই হাজার সালে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন বাংলাদেশের রাজধানীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে মিলিত হইয়াছিলেন। বাংলাদেশ সফরকালে ক্লিন্টন ঢাকাকে ৯ কোটি ডলার আর্থিক সাহায্য দানে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। মুজিব হত্যাকারীদের মার্কিন মুলুক হইতে বিতাড়ন করিবার জন্যও ক্লিন্টন এইসময় সম্মত হইয়াছিলেন।

ক্লিন্টনের ভারত সফরের পর মার্কিন নিমন্ত্রণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী সেপ্টম্বর মাসে মার্কিন মুলুক পরিভ্রমণ করেন। এইসময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী সহস্রাব্দের রাষ্ট্রসংঘের সভায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ২০০০ সালের নির্বাচিত নয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট যদি পূর্বতন সরকারের নীতি মানিয়া চলেন তাহা হইলে ভবিষ্যতে নিউদিল্লী ও ওয়াশিংটনের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নয়া দিগন্তের উন্মোচনের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। সন্ত্রাসবাদ দমনে ভারত মার্কিন সহমত উভয়দেশের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

## ভারত ও প্রাক্তন সোবিয়েত রাষ্ট্র এবং রাশিয়ার সম্পর্ক

জোটনিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাসী ভারত সোবিয়েত ইউনিয়ন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখিয়াছিল। ১৯৬৮ সালে সোবিয়েত ইউনিয়ন ও ওয়ারশ্ চুক্তির রাষ্ট্রদের চেকোস্লোভাকিয়াতে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ভারত প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিল। নিরাপত্তা পরিষদে চেকোস্লোভাকিয়া হইতে সোবিয়েত ও ওয়ারশ্ চুক্তি সংস্থার রাষ্ট্রদের সৈন্য অপসারণের প্রস্তাবে ভারতের সম্মতি ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ যখন ইহার সহিত সোবিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করে তখন ভারত তাহাতে আপত্তি জানায়। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলি ভারতের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবের মধ্যে নিন্দাসূচক শব্দ অনুপ্রবেশ করাইলে ভারত ভোটদানে বিরত ছিল।

১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের প্রভাব অন্যান্য পরাধীন দেশের ন্যায় তৎকালীন ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল। স্বাধীনতার পরবর্তী বৎসরগুলিতে ইংগ-মার্কিন শক্তি উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা করিলে ভারত তাহার বিরোধিতা করে নাই ; মালয়তে ইংরাজ সরকারের দমননীতিতেও ভারত বাধাদান করে নাই এবং কমনওয়েলথের সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছিল। বামপন্থীদের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভারত সরকারের বিরোধিতার ফলে ভারত সোবিয়েত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইবার সম্ভাবনা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

কিন্তু কোরিয়াতে ও ইন্দোচীনে ভারতের শান্তিপ্রচেষ্টা, কমিউনিস্ট চীনকে স্বীকৃতি দান ও রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ দিবার প্রশ্নে সমর্থন জ্ঞাপন, রাষ্ট্রসংঘে ও রাষ্ট্রসংঘের বাহিরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে সমর্থন এবং জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করিবার ফলে ভারত-সোবিয়েত মৈত্রী স্থাপনের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। পাকিস্তান পাশ্চাত্য সামরিক জোটে যোগদান করিলে ভারত ও সোবিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। সোবিয়েত ইউনিয়নের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি ভারত ও সোবিয়েত মৈত্রী দৃঢ়তর করিয়াছিল।

কাশ্মীর প্রশ্নে সোবিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে সমর্থন করিয়াছিল। গোয়াতে পর্তুগালের বিরুদ্ধে ভারতের পুলিশী ব্যবস্থাতে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগোষ্ঠী বিরোধিতা করিয়াছিল। কিন্তু সোবিয়েত ভেটোর ফলে নিরাপত্তা পরিষদের মারফত কোন প্রকার হস্তক্ষেপ সম্ভবপর হয় নাই। ১৯৬২ সালে ভারত-চীন সংঘর্ষের সময় ভারত সাবেক সোবিয়েত রাশিয়ার সহানুভূতি লাভ করিয়াছিল। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাক বিরোধের মীমাংসার জন্য সাবেক সোবিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন তাসখন্দে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুবখাঁকে একটি সম্মেলনে মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। ইহার ফলশ্রুতিতে ১৯৬৬ সালের ১০ই জানুয়ারী তাসখন্দ ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল এবং এই উপমহাদেশে শান্তি স্থাপিত হয়।

ভারতের আর্থিক উন্নয়নে সাবেক সোবিয়েত ইউনিয়ন সহযোগিতা করিয়াছিল। স্টালিনের মৃত্যুর পরবর্তী যুগে সাবেক সোবিয়েত নীতির পরিবর্তন ও বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে পণ্ডিত নেহেরু লোকসভায় একটি বিবৃতিতে স্বাগত জ্ঞাপন করেন (২০শে মার্চ, ১৯৫৬ খ্রীঃ)। অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারতের শিল্পে স্বনির্ভর হইবার প্রচেষ্টা সাবেক সোবিয়েত রাশিয়া কর্তৃক সমর্থিত হয়। ভারী শিল্পোৎপাদনে এইজন্য সোবিয়েত সাহায্য গুরুত্বপূর্ণ হিরাকুদ, কোরবা, ভাকরা ও অন্যান্য সাতটি কেন্দ্রে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে সোবিয়েত সাহায্যের প্রয়োজন অনুভূত হয়। প্রায় ৬৬টি প্রধান শিল্পকেন্দ্র নির্মাণে ভারতকে সোবিয়েত ইউনিয়ন সাহায্য করিয়াছে। রাঁচী ইনজিনিয়ারিং কারখানা, ভিলাই লৌহ কারখানা, বারৌনী তৈলশোধনাগার, মাদ্রাজ সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ফ্যাক্টরী প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ভারত-সোবিয়েত সহযোগিতার নিদর্শন। সাবেক সোবিয়েত রাশিয়া ভারতকে সর্বাধিক সামরিক সাহায্য প্রেরণ করিয়াছে। মিগ বিমান নির্মাণ প্রকল্প সোবিয়েত সহযোগিতার ফলে সম্ভবপর হইয়াছে। ভারত জোটনিরপেক্ষ দেশ ও মার্কসীয় এবং তথাকথিত স্বাধীন দুনিয়ার শক্তিদ্বন্দ্বে দূরত্ব বজায় রাখিবার পক্ষপাতী। কিন্তু শান্তিকামী হিন্দুস্থানের বিশ্বশান্তির জন্য প্রচেষ্টায় ও সীমান্তে শান্তিরক্ষার সংগ্রাম সোবিয়েত সাহায্যে শক্তিশালী হইয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৮ সালে সোবিয়েত ইউনিয়ন পাকিস্তানকে অস্ত্রসরবরাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে পর্যবেক্ষকগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই সূত্রে শ্রীমতী গান্ধী মন্তব্য করেন যে,—"We are not happy about it"। কিন্তু ১৯৭১ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় যখন ইসলামাবাদ বেজিং ও ওয়াশিংটনের মদত লাভের ফলে শক্তিশালী হইয়াছিল সেই সংকটে ভারত-রুশ মৈত্রী সাবেক সোবিয়েত রাষ্ট্রের সহিত ভারতের বন্ধুত্বের উজ্জ্বল উদাহরণ স্থাপন করে।

## ১৯৭১ সালের চুক্তি ও তৎপরবর্তীকালে ভারত-সোবিয়েত মৈত্রী ও সহযোগিতা

১৯৭১ সালে ভারত ও সোবিয়েত মৈত্রী চুক্তিতে "শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সহযোগিতার নীতি রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার বিভিন্নতা সত্ত্বেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনে সহায়ক" বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। এই চুক্তিতে ভারত ও সাবেক সোবিয়েত রাশিয়া রাষ্ট্রসংঘের সনদের নীতি ও উদ্দেশ্যের প্রতি উভয় রাষ্ট্রের অবিচল আস্থা জ্ঞাপন করিয়াছিল। ১৯৭১ সালের ভারত-সোবিয়েত চুক্তির চতুর্থ ধারায় ভারত শান্তিকামী সোবিয়েত নীতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ও সকল জাতির সহিত এই নীতিতে মৈত্রী ও সহযোগিতা কাম্য বলিয়া বর্ণনা করে। এই চুক্তির ৮নং ধারায় উভয় রাষ্ট্র অপর পক্ষের বিরুদ্ধে পরিচালিত কোন সামরিক জোটে যোগদান করিবে না বলিয়া স্বীকৃত হয়। স্বাক্ষরকারীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে আগ্রাসনে রত কোন তৃতীয়পক্ষকে সাহায্য করিবে না ও অন্যকোনপক্ষকে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রদ্বয়ের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের জন্য তাহাদের ভূখণ্ড ব্যবহার করিতে দিবে না বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। ৯নং ধারায় সশস্ত্র সংগ্রামে কোন তৃতীয়পক্ষ

যদি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রদ্বয়ের কোন একপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহা হইলে তাহাকে সাহায্য করিবে না বলিয়া উভয়ে ঐকমত হইয়াছিল।

## বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সোবিয়েত সমর্থন

পূর্ব পাকিস্তানে স্বৈরাচারী অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে ও ভাষা আন্দোলন এবং গণতান্ত্রিক শক্তির শ্বাসরোধের প্রতিবাদে গণঅভ্যুত্থান হয়। এইসময় নিক্সনের ইসলামাবাদের মধ্যস্থতায় বেজিং সফরের ফলে মার্কিন-চীন মৈত্রীর সম্ভাবনার সহিত ভারতের ১৯৭১ সালের সোবিয়েত মৈত্রীর সম্পাদনকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কিন্তু কেবলমাত্র সমকালীন ঘটনা প্রবাহের চাপেই এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় নাই। পাকিস্তান বা চীন কাহারো বিরুদ্ধে এই উপমহাদেশে ভারতকে শক্তিশালী করিবার জন্য বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিকে প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে ভারত-সোবিয়েত মৈত্রীর মাধ্যমে স্বার্থসিদ্ধি করার ইচ্ছা স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রদের ছিল না। বিশ্বশান্তির জন্য ভারত ও সাবেক সোবিয়েত ইউনিয়ন সহযোগিতা বৃদ্ধির সদিচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া তাহাদের মৈত্রীবন্ধনকে সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সলের চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল। পরবর্তীকালে সাবেক সোবিয়েত ইউনিয়ন ১৫টি অংশে ভাগ হইয়া যাওয়াতে এই সন্ধির নিরাপত্তা সংক্রান্ত ধারা বাতিল হইয়া গিয়াছে কারণ রাশিয়া প্রাক্তন সোবিয়েত চুক্তিগুলির শর্তাবলীকে অস্বীকার করে নাই। কিন্তু ভারতের সঙ্গে তাহার এখন আর ১৯৭১ সালের সন্ধিভিত্তিক সম্পর্ক নাই।

১৯৭১-এ ভারতীয় উপমহাদেশে বাংলাদেশের নবজাতকের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের মারফতে আবির্ভূত হইবার লগ্ন ক্রমেই নিকটবর্তী হইতেছিল। এই নবজাতকের জন্মবেদনা পাকজঙ্গি শাহীর অত্যাচারে বৃদ্ধি পায়। শতসহস্র মানুষ পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) হইতে এইসময় ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ভারত-পাক সীমান্তে এইযুগে নানা বিরোধের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। ভারত-পাক উত্তেজনা হ্রাসের জন্য উদ্বাস্তুদের স্বস্থানে প্রেরণের উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এইমর্মে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর সোবিয়েত ইউনিয়ন পরিভ্রমণকালে শান্তির উদ্দেশ্যে একটি সোবিয়েত-ভারত যুক্ত বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তিস্থাপনের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের ৩ তারিখে পাকিস্তান পশ্চিমের সীমান্তে ভারতের উপর হামলা শুরু করিলে ভারত-পাক যুদ্ধের সূত্রপাত হয় ও ভারতীয় সৈন্য পশ্চিম ও পূর্বসীমান্তে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই সময় ভারতীয় সৈন্য ও বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর যুক্তসংগ্রাম পূর্ব পাকিস্তানকে খান সৈন্যের অত্যাচার হইতে মুক্ত করে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়।

এই যুদ্ধ চলাকালীন সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেণ্টের মুখপাত্র ভারতকে যুদ্ধ শুরু করিবার জন্য দায়ী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পাক বিমান ভারতে বোমাবর্ষণ করিয়া যুদ্ধাবস্থার পূর্বে যুদ্ধের সূচনা করিয়াছিল ও পূর্ব পাকিস্তানের দলে দলে উদ্বাস্তুকে ভারতে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করিয়া হিন্দুস্থানের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি বানচাল করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছিল। সেই কারণে প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি দমন করিবার ও সংঘর্ষ শুরু করিবার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রসংঘের সভায় সোবিয়েত রাশিয়া যুদ্ধ বিরতি ও রাজনৈতিক প্রশ্নের সমাধান একসাথে সম্পন্ন করিবার স্বপক্ষে বক্তব্য পেশ করিয়াছিল। এইজন্য ৬ই ডিসেম্বর যখন ওয়াশিংটন ও বেজিং জোটবদ্ধ হইয়া নিরাপত্তা পরিষদে একটি প্রস্তাবের মারফতে সাময়িক যুদ্ধবিরতি, উভয় পক্ষের সৈন্য প্রত্যাহার ও সেক্রেটারী জেনারেল কর্তৃক পাক-ভারত সীমান্তে পর্যবেক্ষক নিয়োগের দাবি উত্থাপন করে তখন সাবেক সোবিয়েত ইউনিয়ন এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে

ভেটো প্রয়োগ করিয়াছিল। এই ধরনের প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানে পাক অপকীর্তি কায়েম করা এবং সেইজন্য এই নীতির বিরোধিতা করিয়া সোবিয়েত ইউনিয়ন দুইবার ভেটো প্রয়োগের মারফতে বানচাল করিয়াছিল। সাধারণ সভায়ও সোবিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এবং অন্যান্য এগারোটি রাষ্ট্র এইধরনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে পুনরায় ১৩ই ও ২১শে ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাবিত রাজনৈতিক প্রশ্নের সমাধানের সহিত সম্পর্কবিহীন তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবও সোবিয়েত বিরোধিতায় গৃহীত হয় নাই। অবশেষে ভারত স্বেচ্ছায় বাংলাদেশ হইতে সৈন্য প্রত্যাহার করিয়া বাস্তবক্ষেত্রে তাহার সদিচ্ছার প্রমাণ দিলে সোবিয়েত ইউনিয়ন ভারতের শান্তিনীতিকে অভিনন্দিত করিয়াছিল। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিবাদ মীমাংসার জন্য সিমলা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে তাহাকে সোবিয়েত ইউনিয়ন সর্বান্তকরণে সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছিল। বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের ক্ষমতা লাভের পর প্রয়াত পাক নেতা জেড, এ, ভুট্টো সাবেক সোবিয়েত ইউনিয়ন সফরের জন্য পদার্পণ করিলে, সোবিয়েত নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সৌহার্দ স্থাপনের প্রচেষ্টা সম্পর্কে পাকনেতাকে অবহিত করিয়াছিলেন এবং উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষের পরিবর্তে সহযোগিতাই কাম্য বলিয়া অভিমত দিয়াছিলেন।

## ভারত-সোবিয়েত মৈত্রীর অগ্রগতি

১৯৭৩ সালে সোবিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান ব্রেজনেভ নিউ দিল্লীতে আগমন করিয়া ভারত ও সোবিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে একটি ১৫ বৎসরের চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। জনতা সরকার ক্ষমতা লাভের পর ভারত-সোবিয়েত মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তির পরিবর্তন করা হয় নাই। চীনা সৈন্য ১৯৭৯ সালে ভিয়েতনামের-সীমা লঙ্ঘন করিয়া আক্রমণ করিলে সাবেক সোবিয়েত ইউনিয়নের তরফ হইতে কোসিগিন ও ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই যুক্ত বিবৃতিতে ভিয়েতনামে চীনের আগ্রাসনের নিন্দা করেন।

ভারত-সোবিয়েত কারিগরী বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার অন্যতম নিদর্শন হিসাবে ১৯শে এপ্রিল ১৯৭৫ সালে ভারতের কৃত্রিম উপগ্রহ আর্যভট্ট সোবিয়েত রকেটের সহায়তায় মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়। ১৯৮৪ সালের ৩রা এপ্রিল প্রথম ভারতীয় মহাকাশচারী রাকেশ শর্মা সোবিয়েত মহকাশচারীদের সহিত সোবিয়েত মহাকাশযানে পরিভ্রমণ করেন ও নিরাপদে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। এই ঘটনা ভারত ও সাবেক সোবিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে মৈত্রীর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

১৯৮২ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর মস্কো হইতে প্রচারিত একটি যুক্ত বিবৃতিতে ভারত ও সোবিয়েত ইউনিয়ন উভয় দেশের স্বার্থে পারস্পরিক মৈত্রীবন্ধন সুদৃঢ় ও প্রসারিত করিয়া উভয় দেশের জনগণকে উপকৃত করিবার ও আন্তর্জাতিক শান্তিকে শক্তিশালী করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। অর্থনীতি, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা ও সাংস্কৃতিতে ভারত-সোবিয়েত সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করিবার জন্য ১৯৮২ সালে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল। অস্ত্রপ্রতিযোগিতার বৃদ্ধি ও পরমাণু যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে এই সময় উভয় দেশ উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছিল এবং ভারত ও সাবেক সোবিয়েত ইউনিয়ন পঞ্চশীল নীতির ভিত্তিতে সহযোগিতা ও সহাবস্থানের প্রতি তাহাদের দৃঢ় আস্থা ঘোষণা করিয়াছিল। রাষ্ট্র সংঘের ঘোষণা অনুযায়ী ভারত মহাসাগরকে শান্তির এলাকায় পরিণত করার কথাও এইসময় ঘোষণা করা হয়। প্যালেস্টাইনে পি, এল, ও-র দাবি অনুসারে পৃথক রাষ্ট্রের সৃষ্টি করা, দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্য ও জাতিবিদ্বেষ নীতির অবসান করা, নামিবিয়ার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতিদান করা ও নয়া উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক শান্তিকে গুরুত্বপূর্ণভাবে শক্তিশালী করার বিষয়ে উভয় রাষ্ট্র ঐকামত হইয়াছিল। ১৯৮২ সালে পুনরায় ভারত ও সোবিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭৯ সালে সম্পাদিত ভারত-সোবিয়েত

অর্থনৈতিক সহযোগিতার চুক্তিকে শক্তিশালী করিয়াছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হইয়া প্রয়াত রাজীব গান্ধী ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীকে গুরুত্বদান করিয়াছেন।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে মিখাইল গর্বাচেভের ক্ষমতালাভের পর যে সকল পরিবর্তন শুরু হইয়াছিল তাহাতে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মৈত্রী বন্ধনে ফাটল ধরে নাই বরং উভয়দেশের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইয়াছিল। ১৯৮৬ সালের নভেম্বর মাসে সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান গর্বাচেভ ও তাঁহার পত্নী রাইসা ভারত পরিভ্রমণ করেন। এই সময় ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতার প্রসারের জন্য আর্থিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় এটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল যাহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্যান্য প্রদেশে চারিটি প্রকল্পে সোভিয়েত ইউনিয়ন সাহায্যদান করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। ১৯৮৯ সালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে রুবলের অবমূল্যায়ন হয়। মার্কিন ডলারের তুলনায় রুবলের অবমূল্যায়ন হইয়াছিল প্রায় দশগুণ। ইহার ফলে ভারতে শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া স্বাভাবিক, কারণ ভারত সোভিয়েত আর্থিক সহযোগিতার জন্য বহুক্ষেত্রে রুবলের সহায়তা ও বিনিময় ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহা ব্যতীত পাকিস্তান ও বাংলাদেশের উত্থাপিত দক্ষিণ এশিয়াতে আনবিক মুক্ত অঞ্চল গড়নের সমর্থনে ও ভারতের বিরুদ্ধে সোভিয়েত 'ভেটো' প্রয়োগকে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর ব্যতিক্রমী ঘটনা বলিয়া গণ্য করিয়াছিল (নভে. ১৯৯১ খ্রীঃ)। ইহার কিছুকাল পরেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৫টি অংশে বিভক্ত হয় এবং ইহাদের মধ্যে ১১টি কমনওয়েলথ অব ইন্ডিপেণ্ডেন্ট স্টেটস্ বা সি. আই. এস গঠন করিয়াছিল। এই সি. আই. এস-র মধ্যে রাশিয়া তাঁহার অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল ও নিরাপত্তা পরিষদে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিল। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সহিত ভারতের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে চুক্তিতে যে কোন তৃতীয়পক্ষের আক্রমণের বিরুদ্ধে পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি ও অন্যান্য বিষয়ে তৃতীয়পক্ষের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সহায়তা দান সংক্রান্ত শর্তাবলী বাতিল হইয়া গিয়াছে।

ভারত-রুশ সম্পর্ক. সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ভারত-রুশ সম্পর্ক এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য প্রজাতন্ত্রের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ এই সম্পর্কে সন্দেহ নাই। মার্কিন বাধা সত্ত্বেও রাশিয়া ভারতকে আণবিক গবেষণায় সহায়তা করিতে ক্রায়োজেনিক মেশিন প্রেরণ করিতে রাজি হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৯৩ সালে রাশিয়া এই শর্ত পালনে তার অক্ষমতা জানায়। ইহাতে ভারত-রুশ মৈত্রীর কোন ফাটল ধরে নাই। মিখাইল গর্বাচেভের ভারত ভ্রমণের সময় প্রাভদা পত্রিকায় পরবর্তীকালের ১৯৯৯ সালে কিছু কালের জন্য রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী প্রিমিকভ লিখিয়াছিলেন যে, ভারত ও সাবেক সোভিয়েত রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিভিন্ন বিষয়ে উভয়ের অভিন্ন স্বার্থের জন্য ও দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে কোন স্ববিরোধের অস্তিত্ব না থাকায় সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। প্রায় একদশক পরে রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট ইয়ালৎসিনের প্রতিনিধি রূপে প্রিমিকভ এই প্রত্যাশাকে বাস্তব রূপদানের জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণে আগ্রহী হইয়াছিলেন। রাশিয়া ও ভারত পূর্বতন সোভিয়েত-ভারত মৈত্রীর ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া এই সময় প্রতিরক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্য আর্থিক ও কারিগরি ও অন্যান্য বিষয়ে পরস্পরের দিকে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করিয়াছিল। রাশিয়া এইসময় ভারতকে রকেট উৎক্ষেপণ যন্ত্র (rocket booster) ও আণবিক রিএক্টর (১৯৯৭) প্রেরণ করিতে সম্মত হইয়াছিল। প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন ১৯৯৮ সালে রাশিয়া ভ্রমণের সময় ভারতে রুশ প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম যাহাতে প্রেরণ করা না হয় সেইজন্য ক্রেমলিনকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই অনুরোধ রক্ষা করা রাশিয়ার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। ১৯৯৯ সালে কার্গিলে পাক অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নের জন্য ভারতের প্রয়াসকে রাশিয়া সর্বান্তকরণে সমর্থন জানায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তরসূরী রুশ ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট পুতিন দুই হাজার সালের অক্টোবর মাসে ভারত সফরে এসে দিল্লিতে সাক্ষাৎ করেন। প্রেসিডেন্ট পুতিনের এই ভারত সফরের মাধ্যমে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী নতুন সহযোগিতার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ভারত ও রাশিয়া একসময়ে ১১টি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে একবিংশ শতকে ভারত-রুশ সহযোগিতার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছিল। একবিংশ শতকে ভারত-রুশ সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক উভয়ের স্বার্থের মধ্যে সহযোগিতার জন্য একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করা হয়েছিল। (Declaration of Strategic Partnership)। ১৯৭১ সালের ভারত-সোভিয়েত চুক্তি ও ঘোষণাপত্রের ন্যায় দুই হাজার সালের এই রুশ-ভারত ঘোষণা উভয়দেশের মধ্যে মৈত্রীর সম্পর্ককে সুদৃঢ় করেছিল। এই ঘোষণাপত্র কোন তৃতীয় দেশের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত হয় নাই। এই ঘোষণা পত্রে স্বাক্ষরকারী উভয় দেশ চাইছিল যে, উভয়দেশে কোন রাজনৈতিক, সামরিক অথবা অন্য কোন জোটে বা দলে অথবা সামরিক বা আক্রমণাত্মক মেলবন্ধনে কোন একটির বিরুদ্ধে সংগঠিত হইবে তাহাতে অন্য স্বাক্ষরকারী অংশগ্রহণ করিবে না। অনুরূপভাবে কোনরূপ সন্ধি বা চুক্তি অথবা সমঝোতা যা এই দুই দেশের কোন একটির স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় নিরাপত্তা বিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত তাহাতে স্বাক্ষরকারীরা যোগ দিবে না।

এই ঘোষণাপত্রের সঙ্গে যে ১১টি সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাহাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ২০১০ সাল পর্যন্ত পারস্পরিক সহযোগিতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা ছিল। এছাড়া কৃষি, তথ্য যোগাযোগ পারস্পরিক আইনসংক্রান্ত ও বিচার এবং কোম্পানী বিষয়ক সমস্যা সমাধান উভয়দেশ পরস্পরের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছিল। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উভয়দেশ বিনিময় ও সহযোগিতার প্রস্তাব প্রসারিত করিয়াছিল। বাণিজ্যের প্রসারের জন্য বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানীগুলির মধ্যে সহযোগিতার পথ এই সময় প্রসারিত করা হয়েছিল। এমনকি ভারতে বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ও রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে এই সকল চুক্তির ফলে সহযোগিতার পথ প্রসারিত হয়েছিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

# সন্ত্রাসবাদ ও পরমাণু কূটনীতি

কাশ্মীর সমস্যা এবং কাশ্মীরের সন্ত্রাস প্রধানত পাক-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিষয়। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ-এরও এখন বিশ্বায়ন ঘটেছে, উদ্ভব হয়েছে অতি-জাতিক বা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের। সন্ত্রাসের ব্যাখ্যা দুদিক দিয়ে হতে পারে। যারা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়, তারাও যেমন সন্ত্রাসবাদী, তেমনি রাষ্ট্র যখন সন্ত্রাসবাদ দমন করবার জন্য একইভাবে অস্ত্র প্রয়োগ করে তখন সেই রাষ্ট্রও সন্ত্রাসবাদী, বিশেষজ্ঞরা কায়দা করে তাকে বলেন প্রতি-সন্ত্রাসবাদী (Counter terrorist)। আসলে সন্ত্রাসবাদী এবং প্রতি-সন্ত্রাসবাদী, দুজনেই যতটা হিংস্র, ঠিক ততটাই সন্ত্রস্ত। অবদমিত সামাজিক-রাজনৈতিক মানসিকতার মধ্যেই এর জন্ম। মার্কিন বিচারপতি ব্রানান বা নোবেলজয়ী জার্মান লেখক গুন্টার গ্রাস এভাবেই সন্ত্রাসবাদকে ব্যাখ্যা করেছেন।

ইতিহাসের দিক থেকে সন্ত্রাসবাদ নতুন কিছু নয়। ঔপনিবেশিক আমলে পরাধীন সমাজে নরমপন্থী আন্দোলনের ব্যর্থতা থেকে সন্ত্রাসবাদের জন্ম হয়েছিল। ফ্যাসিস্ট শাসককে সন্ত্রস্ত করবার জন্যও একই পথ নেওয়া হত। আলজিরিয়া, নামিবিয়া বা সাইপ্রাসে রাষ্ট্রীয় পাশবিকতার জবাব দেওয়া হয়েছিল সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে। ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে ভগত সিং বলেছিলেন, "Violent action against imperialist rule in times of terrible necessity" হলো মানুষের স্বাভাবিক অধিকার। একই যুক্তি ছিল আইরিস রিপাবলিকান আর্মি (IRA), প্যালেস্তাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (PLO) বা লিবারেশন টাইগারস অব তামিল ইলমের (LTTE)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছিল স্প্যানিস বস্ক ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট (Spanish Basque Nationalist Movement)। ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সন্ত্রাসবাদের সেটা একটা ধ্রুপদী উদাহরণ। অনেক সময়েই সন্ত্রাসবাদ আর জাতীয়তাবাদ একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ হয়ে যায়। LTTE নেতা পিরুভিরাকরণ শ্রীলঙ্কার চোখে সন্ত্রাসবাদী বিচ্ছিন্নতাকামী জঙ্গী নেতা। যদি সত্যিই কোনোদিন স্বাধীন তামিল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনিই হয়ত 'জাতির জনক' হয়ে যাবেন। অযৌক্তিক হলেও কাশ্মীরের জঙ্গীরা অনেকেই নিজেদের স্বাধীনতা যোদ্ধা মনে করে। একই আদর্শ নিয়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে হামাস, হেজবোল্লা প্রভৃতি জনগোষ্ঠী।

কুড়ি শতকের শেষে সন্ত্রাসবাদের একটি লক্ষ করবার মতো আন্তর্জাতিক ধরন তৈরি হয়েছে। প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিকতা এখন নেই, কিন্তু উন্নত বিশ্বের হাতে অনুন্নত বিশ্বের, অপেক্ষাকৃত উন্নত রাষ্ট্রের হাতে অনুন্নত রাষ্ট্রের নিপীড়িত হওয়ায় ঘটনা আছে।

এই অত্যাচারিত রাষ্ট্রীয় সমাজের একটা অংশের নৈরাশ্য সন্ত্রাসী মানসিকতায় রূপান্তরিত হয়, ঐ রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রশক্তির কাছে অর্থ, মদত ও অস্ত্র তারা পেয়ে যায়, কখনো কখনো রাজনৈতিক আশ্রয় ও কূটনৈতিক প্রশ্রয়ও তারা পায়, এইভাবেই তারা শুরু করে সীমান্তপারের সন্ত্রাস (Cross-border terrorism)। এই সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলোর অস্ত্রব্যবহারের ধরনও বদলে গেছে, তার একটা কারণ অবশ্যই যুদ্ধপ্রযুক্তির অকল্পনীয় উন্নতি। সন্ত্রাসবাদেরও এখন অনেক মুখ : ব্যক্তি-সন্ত্রাসবাদ (Personal Terrorism), ধ্বংসক সন্ত্রাসবাদ (Catastrophic Terrorism), জৈব সন্ত্রাসবাদ (Bio-Terrorism) কিংবা পরমাণু সন্ত্রাসবাদ (Atomic Terrorism)।

দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত যেহেতু অব-উপনিবেশিত জগতের সবচাইতে বড় রাষ্ট্রশক্তি, তাই তার বিভিন্ন অঞ্চলে কেন্দ্র-বিরোধী সন্ত্রাসবাদ থাকা স্বাভাবিক। সমস্যা এই যে, অন্যান্য ছোট ছোট রাষ্ট্রের সমস্যাও ভারতকে আঘাত করে আবার ভারতের প্রভুত্বের আশঙ্কায় সন্দিগ্ধ রাষ্ট্রগুলো ভারতবিরোধী সন্ত্রাসবাদীদের সীমান্তিক (cross border) সাহায্যও দেয়। এতে ভারতের সঙ্গে ঐ রাষ্ট্রগুলোর সম্পর্কের সমস্যা হয়। যেমন আলফা সন্ত্রাসবাদ ভারত-ভুটান ও ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক, কাশ্মীরী সন্ত্রাসবাদ পাক-ভারত সম্পর্ক, নেপালের মাওপন্থী সন্ত্রাসবাদ ভারত-নেপাল সম্পর্ক এবং তামিল ইলমের সন্ত্রাসবাদ ভারত-শ্রীলঙ্কা সম্পর্ককে আঘাত করে।

তবে সন্ত্রাসবাদের আসল আন্তর্জাতিকায়ন ঘটে ২০০১ সালে আল-কায়দা জঙ্গীদের হাতে আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার আক্রান্ত হওয়ার পর (১১ সেপ্টেম্বর)। পার্ল হারবার আমেরিকাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নামিয়েছিল, নিউইয়র্কে এই হামলা তাকে সন্ত্রস্ত স্বঘোষিত বিশ্বের অভিভাবকে পরিণত করেছে। সন্ত্রাসবাদীরা যতটা না সন্ত্রাসের বিশ্বায়ন ঘটিয়েছে, তার চাইতে অনেক বেশি সন্ত্রাসের আন্তর্জাতিকায়ন সম্ভব করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'Operation Enduring Freedom' বা 'Operation Anaconda'।

আমেরিকার প্রতিসন্ত্রাসবাদের মূল লক্ষ্য মুসলিম জগত। একথা মনে করবার কোনো কারণ নেই যে, শুধু মুসলিম মৌলবাদ থেকেই সন্ত্রাসবাদ ছড়ায়। ইউরোপে বহু খ্রিস্টান মৌলবাদী-সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আছে, জাপানে আছে আওম শিঙ্গরি কিইও (Aun Shinjri Kyu), ভারতেও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ মৌল-সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু তবুও যেহেতু তেলশোষক আমেরিকার সঙ্গে মুসলিম জগতের সংঘাতটাই মুখ্য, মার্কিনীরা তাই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ বলতে মুসলিম সন্ত্রাসবাদকেই বোঝে। তাদের চোখে এর কেন্দ্রীয় চরিত্র হলেন ওসামা বিন লাদেন। ঐ যেন মুসলমানের ধর্ম আমেরিকাবাদ-এর লড়াই। তাঁর মার্কিন বিদ্বেষ নিয়ে আফগানের বন্দুকের ওসামা বিন

করেছেন। আল-কায়দার ৬০টি আন্তর্জাতিক শাখা আছে বলে জানা গেছে। রাশিয়ার চেচেন-বিদ্রোহী, ফিলিপিন্সের 'আবু-সইফ' উগ্রপন্থী, প্যালেস্টাইনের আবু জুবেইদা বা কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদী সকলেই আল-কায়দার সঙ্গে যুক্ত, এখানে সমাজ-সংস্কৃতি-ভাষা, সীমান্ত সব একাকার হয়ে অতিজাতিক এক অবয়বের (trans-national structure) সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু সেই সঙ্গে দেখা দিয়েছে মার্কিন আধিপত্যবাদের এক নতুন চেহারা। সন্ত্রস্ত বিশ্বের স্বঘোষিত অভিভাবক' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতি-সন্ত্রাসবাদের অছিলায় বিভিন্ন দেশে সামরিক ঘাঁটি তৈরি করতে শুরু করেছে, এমনকি সার্বভৌমত্ব, ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের নতুন ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করছে। মার্কিন বিদেশ সচিব কলিন পাওয়েল-এর পরিকল্পনা উপদেষ্টা রিচার্ড হাস (Richard Hass)-এর মন্তব্য তারই ইঙ্গিত দেয় (মার্চ, ২০০৩) : "Sovereignty entails obligations. One is not to massacre your own people. Another is not to support terrorism in any way. If a government fails to meet these obligations, then it forfeits some of the normal advantages of sovereignty, including the right to be left alone inside your own territory." এর পাশাপাশি উল্লেখ করতে হয় মার্কিন-দোসর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের বিদেশ-নীতি-উপদেষ্টা রবার্ট কুপার (Robert Cooper) এর কথা। সন্ত্রাস-কবলিত দেশগুলোকে কুপার বর্বর রাষ্ট্রের বর্গে চিহ্নিত করেছেন। ঔপনিবেশিক আমলের শ্বেতপ্রভুত্বের ইউরোপীয় যুক্তিকে ফিরিয়ে এনে তিনি বর্বর রাষ্ট্রগুলোকে 'Westernize' করবার জন্য 'justifiable intervention'-এর কথা বলেছেন, 'need for colonisation' অনুভব করেছেন। তার মতে, "We need to revert to the rougher methods of an earlier era—force, pre-emptive attack, deception, whatever is necessary to deal with those who still live in the 19th century world." একজন ব্রিটিশ সংসদ সদস্য কুপারের এই মন্তব্যে বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন "Tsarina of Russia was better advised by Rasputin than the Prime Minister by this man."

## পরমাণু-কূটনীতি

সন্ত্রাসের প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে কয়েকবছর হলো। কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই, ঠাণ্ডা লড়াই-এর সূচনার সময় থেকে, পরমাণু শক্তির ভয় দেখিয়ে আমেরিকা নিজেই সন্ত্রস্ত করে রাখতে চেয়েছিল গোটা বিশ্বকে। যতদিন সোভিয়েত ইউনিয়ন টিকে ছিল, পরমাণু-শক্তির জোর তারও ছিল। ভারতে একসময়ের মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন কেনেথ গলব্রেথ (John Kenneth Galbraith) দুই বড় রাষ্ট্রের অস্ত্র-

করেছেন। তার-বাজারের ৬০টি আন্তর্জাতিক শাখা আছে বলে জানা গেছে। রাশিয়ার ভেতরে নিয়েছি, ডিভিডেন্ডের 'আনু শীতল' উৎসবই, ম্যাকডোনাল্ডসের আদ্যু ক্রুশ্চান বা কার্নীদের সমুদ্রনগরী সবখানেই তার-বাজারের সাথে যুক্ত, এখানে সমাজ-সংস্কৃতি-জ্ঞান, শিক্ষার সব একসাথে হয়ে আন্তর্জাতিক এক কাঠামো (trans-national structure) সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু সেই সাথে দেখা দিয়েছে মার্কিন আধিপত্যবাদের এক নতুন চেহারা। 'সন্ত্রাস বিরোধী আন্তর্জাতিক অভিযানের' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতি-সন্ত্রাসবাদের অজুহাতে বিভিন্ন দেশে সামরিক ঘাঁটি তৈরি করতে শুরু করেছে, এমনকি সার্বভৌমত্ব, ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের নতুন ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করছে। মার্কিন বিদেশ নীতি বিভাগ পরিকল্পনা-এর পরিচালক উপদেষ্টা রিচার্ড হাস (Richard Haas)-এর বক্তব্য তারই ইঙ্গিত দেয় (হার্স, ২০০৩): "Sovereignty entails obligations. One is not to massacre your own people. Another is not to support terrorism in any way. If a government fails to meet these obligations, then it forfeits some of the normal advantages of sovereignty, including the right to be left alone inside your own territory." এর পাশাপাশি উল্লেখ করতে হয় মার্কিন-যোগসাজশে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের বিদেশ-নীতি-উপদেষ্টা রবার্ট কুপার (Robert Cooper) এর কথা। সন্ত্রাস-কবলিত দেশগুলোকে কুপার ব্যর্থ রাষ্ট্র বলে চিহ্নিত করেছেন। ঔপনিবেশিক আমলের শ্বেতাঙ্গদের ইউরোপীয় যুক্তিকে ফিরিয়ে এনে তিনি ব্যর্থ রাষ্ট্রগুলোকে 'Westernize' করবার জন্য 'justifiable intervention'-এর কথা বলেছেন, 'need for colonisation' অনুভব করেছেন। তার মতে, "We need to revert to the rougher methods of an earlier era—force, pre-emptive attack, deception, whatever is necessary to deal with those who still live in the 19th century world." একজন ব্রিটিশ সাংসদ সমস্ত কুপারের এই বক্তব্যে বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন "Tsarina of Russia was better advised by Rasputin than the Prime Minister by this man."

## পরমাণু-কূটনীতি

সন্ত্রাসের প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে কয়েকবছর হলো। কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই, ঠাণ্ডা লড়াই-এর সূচনার সময় থেকে, পরমাণু শক্তির ভয় দেখিয়ে আমেরিকা নিজেই সন্ত্রস্ত করে রাখতে চেয়েছিল গোটা বিশ্বকে। যতদিন সোভিয়েত ইউনিয়ন টিকে ছিল, পরমাণু-শক্তির জোর তত্ত্ব ছিল। ভারতে একসময়ের মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন কেনেথ গলব্রেথ (John Kenneth Galbraith) দুই বড় রাষ্ট্রের অস্ত্র-

প্রতিযোগিতা আর তাদের ওপর নির্ভরশীল 'client' রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে গড়ে ওঠা 'Arms Quadrilateral'-এর কথা বলেছিলেন। পরমাণু অস্ত্রের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা চতুর্ভুজ ছিল না, শুধুই ছিল 'Arams Duel'। দুই পারমাণবিক রাষ্ট্রের উতোর-চাপান একধরনের Strategic Balance of Power তৈরি করেছিল, পারমাণবিক নিবৃত্তির বা Nuclear Deterrance-এর সম্ভাবনাও সৃষ্টি করেছিল। দ্যাঁতাৎ-এর পর্যায়ে আবার দুটো রাষ্ট্রই পরমাণু শক্তির সীমানা বেঁধে দেওয়ার কূটনীতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। Nuclear Diplomacy বলতে এই কূটনীতিকেই বোঝায়। এর উদ্দেশ্য ছিল, এক, পরমাণু খাতে ব্যয়ের বোঝা কমানো, দুই, আকস্মিক কোনো পরমাণু যুদ্ধের সম্ভাবনা নষ্ট করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য খুবই গুরুত্বময় ছিল, কেননা, পরমাণু শক্তি এমন এক মারণাস্ত্র, যা যুদ্ধে শুধু আক্রান্তকেই ধ্বংস করে না, আক্রমণকারীকেও করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর মার্কিন পরমাণু-নীতির প্রধান লক্ষ্য হয় তিনটি। এক, নিজের পরমাণু শক্তির প্রাবল্য বজায় রেখে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর পরমাণু শক্তিকে সীমায়িত করা, যাতে তাদের ওপর অভিভাবকত্ব বা একাধিপত্য আরও নিশ্চিত হয়; দুই, সোভিয়েত রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনো ছোট রাষ্ট্রের হাতে পরমাণু-প্রযুক্তি গিয়ে থাকলে তা নষ্ট করবার ব্যবস্থা করা; তিন, আল-কায়দা-র মতো অতিজাতিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের হাতে পরমাণু প্রযুক্তির চলে যাওয়া বন্ধ করা। প্রথম লক্ষ্যটি আমেরিকার সঙ্গে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করেছে। দ্বিতীয় লক্ষ্য মার্কিনীদের মধ্যে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের প্রবণতা তৈরি করে দিয়েছে। আর তৃতীয় লক্ষ্য আমেরিকাকে অহেতুক উগ্রতার দিকে নিয়ে গেছে।

কিউবা সংকটের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু-কূটনীতিতে নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছিল। ১৯৬০-৭০-এর দশকে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে অনেকগুলো পরমাণু চুক্তি হয়। ১৯৬৩-তে সই হয় Partial Nuclear Test Ban Treaty। শর্ত ছিল, বায়ুমণ্ডলে, মহাশূন্যে (Outer space) বা সমুদ্রের ওপর ভাগে পরমাণু বিস্ফোরণ-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে না। এরপর থেকেই শুরু হয় ভূগর্ভে পরমাণু পরীক্ষা। ফ্রান্স ও চীন ছাড়া আরও একশটি দেশ এই শর্তেই ১৯৬৩-র চুক্তিতে সামিল হয়েছিল। চীন তার পরমাণুর শক্তি পরীক্ষা করেছিল ১৯৬৪ সালে। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭২-এর মধ্যে আরও পাঁচটি চুক্তি হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন ও আরও ৮৩টি রাষ্ট্রের মধ্যে। এগুলো হলো Outer Space Treaty (১৯৬৭), Nuclear Non-Proliferation Treaty (১৯৮৮), The Seabed Pact (১৯৭১), Biological Warfare Treaty (১৯৭২) এবং Anti-Ballistic Missile Treaty

১৯৭২ সালেই সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান লিওনিদ ব্রেজনেভ এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিকসনের মধ্যকার 'Strategic Arms Limitations Talk (SALT) একটি নির্দিষ্ট পরিণতিতে পৌঁছেছিল। দুপক্ষই সম্মত হয়েছিলেন এই প্রস্তাবে যে, অন্যকে কৌশলে আঘাত করতে সক্ষম এমন পরমাণু অস্ত্রের (Strategic Arms) সংখ্যার ব্যাপারে দুই রাষ্ট্র একটা সীমিত সংখ্যা মেনে চলবে। এই ধরনের অস্ত্রের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) এবং Sub-marine Launched Ballistic Missile (SLBM)। এদের নিয়ে করা চুক্তিদুটো পরিচিত হয়েছিল SALT I এবং SALT II নামে। এর ফলে অবশ্য ICBM-এর ক্ষেত্রে কিছু বাড়তি সুবিধে দেওয়া হয়েছিল সোভিয়েতকে, মার্কিন রাষ্ট্র সুবিধে পেয়েছিল বম্বার এবং ক্রুজ ক্ষেপনাস্ত্রের ক্ষেত্রে। ১৯৮৫ সালে, নিউইউর্ক টাইমস-এর হিসেব অনুযায়ী দু'পক্ষের অস্ত্রসম্ভার ছিল এইরকম ঃ

| অস্ত্রবাহন | অস্ত্রসংখ্যা | মোট সামর্থ্যের শতাংশ |
|---|---|---|
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | | |
| ১,০২৫ ICBM | ২,১২৫ | ১৯ |
| ৬৪০ SLBM সহ ৩৬ সাবমেরিন | ৫,৭২৮ | ৫১ |
| ২৬৩ B-৫২ বম্বার, ১২টি ক্রুজ বহনক্ষম ছিল ৯৮টি | ৩,০৭২ | ২৭ |
| ৬১ FB-III বম্বার | ৩৬৬ | ৩ |
| মোট | ১১,২৯১ | ১০০ |
| সোভিয়েত ইউনিয়ন | | |
| ১,৩৯৮ ICBM | ৬,৪২০ | ৬৫ |
| ৯২৪ SLBM সহ ৬২ সাবমেরিন | ২,৬৮৮ | ২৭ |
| ১৭৩ বম্বার, ২৫টি ছিল ১০টি ক্রুজ বহনক্ষম | ৭৯২ | ৮ |
| মোট | ৯,৯০০ | ১০০ |

কিন্তু ইতিমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপাল্লার টমহক ক্ষেপনাস্ত্র আর সোভিয়েত ইউনিয়নের SS-২০ নিয়ে উভয়ের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। ১৯৮১-র জেনেভা বৈঠকে দুপক্ষই চেষ্টা করেছিল অন্যপক্ষের অস্ত্র বেশি কমিয়ে দিতে। শেষপর্যন্ত যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল তাকে বলা হয়েছিল "Walk in the Woods Proposal"। ঠিক হয়েছিল যে, দু'পক্ষই পঁচাত্তরটি করে ঐ ক্ষেপনাস্ত্র রাখতে পারবে।

এই চুক্তিগুলোর অর্থ ছিল এই যে, পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই বড় রাষ্ট্রদুটি তাদের বাড়তি পরমাণু শক্তি ক্ষয় করে ফেলবে। 'Mutually Assured Destruction' (MAD)-এর মাধ্যমে এও একরকমের 'Nuclear Deterrence'। কিন্তু ১৯৮৩ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগানের একটি ঘোষণা উত্তেজনা আবার বাড়িয়ে দেয়।

রেগান সোভিয়েত ICBM-এর প্রতিপক্ষ হিসেবে একটি পরমাণু প্রতিরক্ষা বলয়ের (Strategic Defence Initiative–SDI) কথা বলেন। নিঃসন্দেহে এটা MAD-এর পরিপন্থী ছিল। আন্তর্জাতিক মহলে রেগানের এই ঘোষণা Star War-এর সূচনা বলেই মনে হয়েছিল এবং সঙ্গত কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘোষণা করেছিল যে, তারাও চুপ করে বসে থাকবে না। অর্থাৎ তৈরি হয়েছিল মহাশূন্যের সামরিকায়নের (militarization of space) সম্ভাবনা। রেগানের প্রতিরক্ষা সচিব ক্যাসপার ওয়েনবার্গার (Casper Weinberger) নিজেই বলেছিলেন, "such an act would be one of the most frightening prospects I could imagine".

১৯৮৫ সালে আবার অবস্থার পরিবর্তন হয়। তার কারণ সোভিয়েত পক্ষের পশ্চাদপসরণ। মিখাইল গরবাচভ সোভিয়েত বিদেশনীতিতেও পেরেস্ত্রোকা আনার কথা বলে পশ্চিমকে বলেছিলেন "we will rob you of your enemy"। এর ফল ১৯৮৫-র রেগান-গরবাচভ বৈঠকে এবং ১৯৯০-এর বুশ-গরবাচভ বৈঠকে ১৯৮২-তে শুরু হওয়া Strategic Arms Reduction Talks (START)-এর চুক্তি-সমাপ্তি। মোট দুটি START চুক্তি হয়েছিল, START I এবং START II। পরমাণু অস্ত্র কমিয়ে আনার কি শর্ত চুক্তি দুটোতে ছিল, তা নিচের হিসেবটি দেখলেই বোঝা যাবে।

১৯৯১—উভয়পক্ষের অস্ত্রসম্ভার

| | ICBM | SLBM | BOMBER | মোট |
|---|---|---|---|---|
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ২,৪৫০ | ৫,৭৬০ | ৪,৪৩৬ | ১২,৬৪৬ |
| সোভিয়েত ইউনিয়ন | ৬,৬১২ | ২,৮৪০ | ১,৫৯৬ | ১১,০১২ |
| | | | | ২৩,৬৫৮ |
| START I : ১৯৯৯-এর মধ্যে এই অস্ত্রসম্ভার কমানো হবে ৩৮ শতাংশ। | | | | |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১,৪০০ | ৩,৪৫৬ | ৩,৭০০ | ৮,৫৫৬ |
| সোভিয়েত ইউনিয়ন | ৩,১৫৩ | ১,৭৪৪ | ১,২৬৬ | ৬,১৬৩ |
| | | | | ১৪,৭১৯ |
| START II : ২০০৩-এর মধ্যে আরও কমানো হবে ৭৩ শতাংশ | | | | |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৫০০ | ১,৭২৮ | ১,২৭২ | ৩,৫০০ |
| সোভিয়েত ইউনিয়ন | ৫০০ | ১,৭৪৪ | ৭৫২ | ২,৯৯৬ |
| | | | | ৬,৪৯৬ |

START সম্পাদনের পর রাশিয়ার ক্ষমতা আরও কমতে থাকে সোভিয়েতের ভাঙ্গনে এবং পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে NATO-র সম্প্রসারণে। আগেই বলা হয়েছে, এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় নিজের পরমাণু ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রেখে স্বীকৃত পরমাণু রাষ্ট্রগুলি ছাড়াও (ব্রিটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন)

তৃতীয় বিশ্বের পরমাণু ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং অভিভাবকত্বের পথ নিষ্কণ্টক করা। এই লক্ষ্যেই রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে আমেরিকা যে প্রস্তাবটি বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে (১৯৯৬) সেটা হলো Comprehensive (Nuclear) Test Ban Treaty (CTBT)-র প্রস্তাব।

সি টি বি টি-র মূল দোষ দুটি। প্রথমত, চুক্তিটি শুধুই প্রথাগত পারমাণবিক বিস্ফোরণকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, অ-বিস্ফোরক পরীক্ষা-নিরীক্ষা (Non-Explosive Testing) বন্ধ করেনি, সুতরাং একে CTBT না বলে Explosive Test Ban Treaty বা ETBT বলাই ভাল। দ্বিতীয়ত, পরমাণু হস্তান্তরের সম্ভাবনাও নষ্ট হয়নি এর ফলে। সি টি বি টি সম্পর্কে ভারতের আপত্তি এইখানেই। প্রথমত, এই চুক্তি অনুন্নত তৃতীয় বিশ্বকে পরমাণু অস্ত্র রাখতে দেবে না, কিন্তু উন্নত বিশ্ব উন্নততর প্রযুক্তির মাধ্যমে অবিস্ফোরক পরীক্ষা চালিয়ে পরমাণু শক্তির বিস্তার ঘটিয়ে প্রথম বিশ্ব-তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে শক্তির ফারাকটা রেখে দেবে। রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি অরুন্ধতী ঘোষ ঠিকই বলেছিলেন, "It perpetuated the existing global insecurity, born of a world, divided unequally into muclear-haves and nuclear-havenots." দ্বিতীয়ত, পরমাণু হস্তান্তরের সুযোগ থেকে যাওয়ায় পাক-ভারত পরমাণু-ভারসাম্যের বিপর্যয় ঘটে যাওয়া এর ফলে অসম্ভব নয়। এই আশঙ্কা আরও বেশি এই কারণে যে, ইতিমধ্যেই চীনের কাছ থেকে পাওয়া পঞ্চাশটিরও বেশি M-II ballistic missile এবং আফগানিস্তানের সূত্রে পাওয়া অনেক স্কাড মিসাইল পাকিস্তানের হাতে আছে।

ভারত তাই নিঃশর্তে সি টি বি টি-তে সই করতে রাজি হয়নি। তার ফলে যে সে আন্তর্জাতিক মহলে নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে তা নয়। বরং স্টিফেন সোলর্ড-এর এই প্রস্তাব যে, ভারত 'নিউক্লিয়ার ক্লাব'-এর সদস্যের মর্যাদা পাওয়ার পর সি টি বি টি গৃহীত হোক, তৃতীয় বিশ্বে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে।

## গ্রন্থনির্দেশ

Harvey W. Kushner (ed.), *Encyclopedia of Terrorism.*
Anindya J. Majumdar (ed.), *Nuclear India into the New Millennium.*
B. M. Bottome, *The Balance of Terror.*
McGeorge Bundy, *Danger and Survival.*
O. Misra and S. Ghosh, *Terrorism and Low Intensity Conflict in South Asian Region.*

সফল হয়, তাহলে মানবসভ্যতা সংকটমুক্ত হবে।

## ১৮. ৬. ভারত ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ
## India and United Nations

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে জাতিপুঞ্জের সদস্যদের দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। সদস্যদের এই দুটি ভাগ হল ঃ মূল সদস্য (Original Members) এবং নির্বাচিত সদস্য (Elected members)। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল সদস্য সম্পর্কে সনদের ধারায় সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত রাষ্ট্র আমেরিকার সানফ্রানসিস্‌কো শহরে ১৯৪৫ সালের এপ্রিল

মাসে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সম্মেলনে (Sanfrancisco Conference) অংশগ্রহণ করেছে অথবা আগেই ১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারির 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণা' (Declaration of the United Nations)-য় স্বাক্ষর করেছে, সেই সমস্ত রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে স্বাক্ষর ও অনুমোদন করার পর এই বিশ্বসংস্থার মূল সদস্য হিসাবে বিবেচিত হবে। সনদের ৩নং ধারায় বলা হয়েছে : "The Original members of the United Nations shall be the states which, having participated in the United Nations Conference of International Organisation at San Francisco, or having previously signed the Declaration by United Nations of January, 1942, sign the present Charter and ratify it in accordance with Article 110." সনদের ৩নং ধারার এই ঘোষণা সত্ত্বেও কতকগুলি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র, ফিলিপিনস এবং ভারতকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল সদস্য হিসাবে গণ্য করা হবে কিনা, এ বিষয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

মূল সদস্য

সমকালীন ভারত ছিল ভূখণ্ডকেন্দ্রিক একটি জনসম্প্রদায় মাত্র। ঐতিহ্যগত রাষ্ট্রীয় সত্তার বৈশিষ্ট্য ভারতের ছিল না। এতদ্‌সত্ত্বেও ভারতকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল সদস্যপদ প্রদান করা হয়। জাতিপুঞ্জের সনদ প্রণয়নের প্রাক্কালে সুপারিশ করা হয় যে, সদস্যপদের দায়-দায়িত্ব গ্রহণকারী সকল স্ব-শাসিত রাষ্ট্র ও ডোমিনিয়ন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য হতে পারবে। যে সময় ধরে দেওয়া হয়েছিল যে, ভারত এই শর্ত পূরণ করে। তবে এটা ঠিক যে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের আগে ভারত আইনগত বা ইতিহাসগত বিচারে, স্ব-শাসিত ডোমিনিয়নের মর্যাদা লাভ করেনি তবে ইতিমধ্যে বিষয়টি বিশ্বব্যাপী বিদিত হয়ে গেছিল যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতার অধিকারকে নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছে। বাকি ছিল শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। এই কারণে ভারতকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল সদস্য হিসাবে স্বীকার করে নিতে কোন তরফ থেকেই তেমন কোন আপত্তি উঠেনি।

ভারত মূল সদস্য

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল সদস্য হিসাবে ভারতের ভূমিকা সব সময়েই সদর্থক ও গঠনমূলক। ভারত বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জের সনদের মূল নীতি, আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে তুলে ধরেছে এবং সনদকে কার্যকর করার ব্যাপারে উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করেছে। ঔপনিবেশিকবাদের বিরুদ্ধে ভারতের জেহাদ সর্বজন বিদিত। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের জ্বালা-যন্ত্রণা ভারতের অজানা নয়। বিদেশী ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন সময়েই ভারত পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী আন্দোলনের পিছনে নৈতিক সমর্থন জুগিয়েছে। ভারত তার স্বাধীনতা সংগ্রামকে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের ঔপনিবেশেকতাবাদ বিরোধী আন্দোলনের সামিল করেছে। ১৯৬০ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে ঔপনিবেশিক শাসনাধীন দেশগুলিকে স্বাধীনতা প্রদানের কথা বলা হয়। জাতিপুঞ্জের এই প্রস্তাবটির প্রতিশ্রুতি দাতা হিসাবে ভারতের নাম সুবিদিত। এই প্রস্তাবটির বাস্তবায়ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার জন্য জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে। পৃথিবীর সকল পরাধীন জাতির জন্য ন্যায় ও স্বাধীনতার স্বার্থে ভারত এ বিষয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মঞ্চে দৃঢ়তার সঙ্গে বক্তব্য রেখেছে এবং সাধ্যমত সক্রিয় হয়েছে। ভারত বলেছে যে ঔপনিবিশিকতাবাদ হল বিশ্বশান্তির পক্ষে বিপদ স্বরূপ। বিশ্বশান্তি ও মানবজাতিকে সুনিশ্চিত করতে হলে ঔপনিবেশিকতাবাদের অবসান অপরিহার্য। ভারত আরও বলেছে যে, ঔপনিবেশিকতাবাদ হল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের এক অশুভ অস্বীকৃতি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভিতরে ও বাইরে ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী সংগ্রামকে ভারত সরকার সতত সমর্থন করেছে। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু ১৯৪৮ সালের ৩রা নভেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় ঔপনিবেশিকতাবাদ এবং বর্ণ-বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে বক্তব্য রাখেন। ভারত এই ভূমিকা থেকে কখনই

ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী ভূমিকা

সরে আসেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে অ্যাফ্রো এশীয় প্রতিটি পরাধীন দেশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের অবসান ও স্বাধীনতা দাবি করেছে। এই সমস্ত দেশ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন সংগঠিত করেছে। ভারত সকল ক্ষেত্রেই এই ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী আন্দোলনের সামিল হয়েছে। ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে দিল্লিতে পনেরটি জাতির একটি সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলন আহ্বানের উদ্দেশ্য ছিল ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিশালী করা। ইন্দোনেশিয়ার মানুষ তখন ডাচ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সামিল হয়েছে। স্বাধীনতা অর্জনের পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদী ডাচদের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার সংঘাত সৃষ্টি হয়। পশ্চিম ইরিয়ানকে নিয়েই সংঘাত দেখা দেয়। ভারত ইন্দোনেশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করে।

ভারত বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। এবং এ ক্ষেত্রেও ভারত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মঞ্চটি ব্যবহার করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ সরকারের জাতিবিদ্বেষ নীতির বিরুদ্ধে ভারত সরকার ছিল সতত সোচ্চার দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের বিরুদ্ধে এই সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ বর্ণবিদ্বেষী নীতি অনুসরণ করতে আরম্ভ করে। ১৯৪৬ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে সাধারণ সভার প্রথম অধিবেশনেই ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে একটি নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, বর্ণবৈষম্য নীতি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের বিরোধী। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে বিবিধ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। ভারত সব সময় এই সমস্ত প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। বর্ণবৈষম্য ও ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী সংগ্রামে ভারত আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রসমূহের সহযোগিতা পেয়েছে। এতদঞ্চলের অধিকাংশ রাষ্ট্রই কোন রকম শক্তিজোটের সামিল হওয়ার বিরোধী। এই শ্রেণীর রাষ্ট্রগুলি জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী। এই সমস্ত রাষ্ট্রের পাশে ভারত সব সময় সহযোগী রাষ্ট্র হিসাবে হাজির ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, বিভিন্ন আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিরোধিতার কারণে দক্ষিণ আফ্রিকাকে কমনওয়েলথের সদস্যপদ ছাড়তে হয়েছে। ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ-প্রভুত্বের ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারের জাতি-বিদ্বেষ বা বর্ণ-বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে বিশ্বের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সকল মানুষ সোচ্চার হয়েছে। ভারত এক্ষেত্রে অনেকাংশে নেতৃত্বমূলক ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিশ্বজনমতের চাপে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার সেখানকার জাতীয় কংগ্রেস নেতা নেলসন ম্যাণ্ডেলাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছে। অতঃপর সে দেশে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রিয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বর্ণবৈষম্য নীতির বিরোধিতা

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহান দায়িত্ব হল বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তাকে নিরাপদ করা। এ ক্ষেত্রে ভারত সব সময় তার সদিচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতাকে সম্প্রসারিত করেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও সম্প্রীতি সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে ভারতের সার্থক ভূমিকা সুবিদিত। নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে এই আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারত বারে বারে আবেদন জানিয়েছে। সকল পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংস করার ব্যাপারে এবং যাবতীয় পারমাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে ভারত তার আন্তরিকতাকে অব্যক্ত রাখে নি। বস্তুত ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সর্বপ্রথম আণবিক শক্তিকে শান্তি ও প্রগতির স্বার্থে ব্যবহারের ব্যাপারে আবেদন জানান। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিশ্বদরবারে পণ্ডিত নেহরুই প্রথম আণবিক শক্তির শান্তিপর্ণ ব্যবহারের বিষয়ে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজনের মাধ্যমে বিশ্বশান্তির জন্য ভারতের প্রয়াস-প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হয়েছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ শান্তি প্রচেষ্টার উদ্যোগে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে শান্তি-মিশন পাঠিয়েছে। এই সমস্ত মিশনের সাংগঠনিক ক্ষেত্রে ভারত অংশগ্রহণ করেছে। এ রকম শান্তি-মিশনের একাধিক উদাহরণ দেওয়া যায়। এগুলি হল ঃ 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ইরাক-কুয়েত পর্যবেক্ষণ মিশন' (UN Iraq-Kuwait Observation Mission— UNIKOM), 'এল

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ

[illegible] (UN [illegible] Mission in [illegible]) [illegible] (UN Transitional Authority in Cambodia) [illegible] (UN [illegible] Operation in Mozambique – ONUMOZ) [illegible]।

[illegible] (International Control Commission) [illegible]।

[illegible]

[illegible] ভূমিকা [illegible] জাতিসংঘ [illegible]।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান সম্ভব করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় তহবিল আছে। এই তহবিলে ভারতের অবদান অবহেলার নয়।

উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আর্থনীতিক সহযোগিতা ও উন্নয়নের জন্য একটি সংগঠন আছে। এই সংগঠনটি 'OECD–Organization for Economic Co-operation and Development' নামে পরিচিত। ভারত এই সংগঠনের সদস্য নয়। এই সংগঠনটির সদস্য নয় পৃথিবীর এ রকম যত রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য তাদের মধ্যে ভারতই সর্বাধিক পরিমাণ অর্থ জাতিপুঞ্জের উন্নয়নমূলক কেন্দ্রীয় তহবিলে প্রদান করে থাকে।

ভারত ও ভারতবাসীর সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদর্থক ভূমিকা উল্লেখ করা আবশ্যক। এ দেশের মানুষের আর্থিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র গড়ে তোলার গুরুদায়িত্ব সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গ্রহণ করেছে। ভারতীয়দের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অভিপ্রেত অগ্রগতির জন্য জাতিপুঞ্জের উদ্যোগ-আয়োজন অনস্বীকার্য। ভারত বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উন্নয়নমূলক যে সমস্ত প্রকল্প প্রণয়ন করে ও কার্যকর করতে উদ্যোগী হয়, সে

ভারতের উন্নয়নে জাতিপুঞ্জের ভূমিকা

রকম অনেক ক্ষেত্রেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সহায়ক ও সহযোগিতামূলক ভূমিকা পালন করে। জাতিপুঞ্জ বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে উন্নয়নমূলক এবং জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী কার্যকর করে থাকে। এই সমস্ত খাতে জাতিপুঞ্জ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় করে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপিকা ড. রুমকি বসু (Rumki Basu)-র একটি মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর *The United Nations* শীর্ষক গ্রন্থে তিনি বলেছেন ঃ 'The United Nations System in India, comprising the country offices of 18 agencies dedicates itself, in the second half-century of the United Nations and of independent India, to rising to the challenge delineated for it by the Secretary-General and to work together as a family at the country level in areas of common human development concern so as to be able to build capacity and add tangible value to national initiatives."

তেলের মতোই জলও যে কূটনীতির বিষয় হিসেবে কিছু কম যায় না, তার প্রমাণ ভারত মহাসাগর (Indian Ocean)। সম্পদ উৎপাদন ও ব্যবহারের সঙ্গে তেলের যোগ, আর উৎপাদন ব্যবস্থা, সম্পদের বাণিজ্য ও সেই বাণিজ্যের নিরাপত্তার সঙ্গে যোগ জলের, অর্থাৎ সমুদ্রের। সমুদ্রের কূটনীতি এমন একটা বিষয়, যা যে কোনো রাষ্ট্রের সীমান্তক আধিপত্য অনেক গুণ বাড়িয়ে দিতে পারে, অথবা সীমান্তের ভেতরের সামাজিক নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে তুলতে পারে। সেই কারণে সমুদ্রের ব্যবহার সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলো কীভাবে করবে, সে সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক বিধির প্রয়োজন হয় সকলেরই, বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর।

## সর্বমান্য সমুদ্র-বিধি

১৯৪৭ সালে যে International Law Commission গড়ে তুলেছিল রাষ্ট্রসংঘ, সেই কমিশন একটি সর্বমান্য বিধির প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে ১৯৫৮ সালে জেনেভায় একটি সভা বসিয়েছিল। এটা ছিল 'United Nations Conference on Law of the Sea'-এর প্রথম সম্মেলন (UNCLOS-I)। এর প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল চারটি ঃ (১) ভূখণ্ডসীমার অধিকারভুক্ত এবং তার সংলগ্ন সামুদ্রিক অঞ্চল (Territorial Sea and Contiguous zone); (২) উপমহাদেশীয় খাঁড়ি এলাকা (Continental Shelf); (৩) রাষ্ট্রনিরপেক্ষ সমুদ্র (High Seas) এবং (৪) সামুদ্রিক প্রাণী-সংরক্ষণ ও মাছ-শিকার (Fishing and Conservation of living resources)। কিন্তু এই সভায় এবং তার পরের সম্মেলনেও (UNCLOS-II) কোনো সর্বমান্য বিধি প্রণয়ন সম্ভব হয়নি। তা শেষপর্যন্ত সম্ভব হয় ১৯৭৬ সালে, অনেক তর্ক-বিতর্কের স্তর পার হওয়ার পর। এই সব আলোচনার পর্বে ছিল ১৯৭৩ সালের নিউইয়র্কের তৃতীয় বৈঠক (UNCLOS-III), ১৯৭৪ সালের কারাকাস সম্মেলন, ১৯৭৫ সালের জেনেভা বৈঠক এবং তার একক সমঝোতাপত্র (Single Negotiating Text-SNT), আর ১৯৭৬ সালের নিউইয়র্ক বৈঠক এবং তার সংশোধিত সনদ (Revised Single Negotiating Text-RSNT)। প্রস্তাবিত সনদটি বিধি হিসেবে স্বাক্ষরিত হয় ১৯৮২ সালে জামাইকায়। ৪৪৬টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত এই সনদটিতে সম্মতি দিয়েছিল ১১৯টি রাষ্ট্র, তার মধ্যে

ব্রিটেন ও আমেরিকাও ছিল। তবে ছ'টি ইউরোপের দেশ আর জাপান এতে রাজি হয়নি। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে সামুদ্রিক সম্পদের যে সর্বজনীন ব্যবহারের কথা বলা হয়েছিল (Common Heritage Principle), সে ব্যাপারে একমত ছিল না তারা।

১৯৭৬ সালের আন্তর্জাতিক সনদটির আটটি নির্দেশ ছিল লক্ষ করবার মতো। এক, ভূখণ্ডসীমার অধিকার (Territorial Waters)। উপকূলীয় রাষ্ট্রের স্থলভূমি থেকে বা দ্বীপময় রাষ্ট্রের বেষ্টনী জলপ্রান্ত থেকে বারো নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত অঞ্চল সেই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের মধ্যে পড়বে, এটাই ছিল সনদের প্রথম শর্ত। দুই, নিরপেক্ষ পারাপার ব্যবস্থার (Transit Passage/Innocent Passage) শর্তে বলা হয়েছিল যে, 'Territorial Waters'-এর পর আরও ১২ মাইল পর্যন্ত এলাকা দিয়ে যে কোনো দেশ অন্য দেশের ক্ষতি না করে বাণিজ্য বা বিমানবাহী পোত পার করতে পারবে। তিন, একনিষ্ঠ অর্থমণ্ডল (Exclusive Economic Zone-EEZ)। UNCLOS-III-এর ৫৬ ও ৫৭ নম্বর বিধি থেকে এই শর্তটি নির্মাণ করা হয়েছিল। কোনো রাষ্ট্রের ভিত্তিভূমি (baseline) থেকে দুশো নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত সমুদ্রে জৈবিক-অজৈবিক সম্পদের অনুসন্ধান ও ব্যবহারের অধিকার সেই রাষ্ট্রের—এটাই ছিল এই শর্তের মূল কথা। চার, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত সমুদ্র (High Seas)। মেনে নেওয়া হয়েছিল যে, প্রথম ও তৃতীয় শর্তে নির্দেশিত নয়, এমন সামুদ্রিক অঞ্চল সর্বজনীন। তবে যেসব রাষ্ট্র সমুদ্রবর্তী নয়, তারাও যাতে সমুদ্রের সুবিধা পায়, সেইজন্য রাখা হয়েছিল পঞ্চম ও ষষ্ঠ শর্ত। শর্তদুটি বিধিবদ্ধ হয়েছিল 'Land Locked States' সংক্রান্ত ৬১ অনুচ্ছেদে এবং 'Geographically Disadvantaged States' সংক্রান্ত ৭০ নম্বর অনুচ্ছেদে। এছাড়াও ছিল সামুদ্রিক গবেষণা ও পরিবেশ রক্ষা বিষয়ে সপ্তম ও অষ্টম শর্তদুটি।

ভারত এই আন্তর্জাতিক সমুদ্রবিধিটিকে সন্তোষজনক মনে করেছিল। প্রায় ছ'শো কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূল জুড়ে পাওয়া সামুদ্রিক অধিকারকে রাষ্ট্রীয় মান্যতা দেওয়ার জন্য সে তার সংবিধানে জুড়ে নিয়েছিল ২৯৭ নম্বর অনুচ্ছেদ।

কিন্তু একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, সামুদ্রিক ব্যবহার বিধি চালু হওয়াতে জলের অধিকার নিয়ে কূটনীতির খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বন্ধ যে হয়নি, তার প্রমাণ ভারত মহাসাগর নিয়ে ক্ষমতা আর স্বার্থের রাজনীতি। এক্ষেত্রে ভারতের পক্ষেও নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকা সম্ভব হয়নি, কেননা, ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড ভারত মহাসাগরের জলেই সিক্ত।

## ভারত মহাসাগর (Indian Ocean)

১৯৫০-এর দশক পর্যন্ত আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারত মহাসাগর তেমন নজর-কাড়া বিষয় ছিল না। ঠান্ডা লড়াইয়ের প্রথম দশ বছরে আমেরিকাও তাকে নিয়ে মাথা ঘামায়নি, সেটা তখনো পর্যন্ত 'British Lake' হিসেবেই পরিচিত ছিল। ১৯৬৮ সালে প্রচণ্ড বাণিজ্য ঘাটতির কবলে পড়ে ব্রিটেন যখন হংকং ছাড়া সুয়েজের পূর্বাংশ থেকে সরে আসার কথা বলতে থাকে, তখন দুনিয়ার নজর গিয়ে পড়ে ভারত মহাসাগরের ওপর। আমেরিকার ধারণা হয়, ব্রিটিশ সিদ্ধান্ত ভারত মহাসাগরে ক্ষমতার শূন্যতা তৈরি করবে। সেই কারণে আমেরিকা ব্রিটেনের সঙ্গে একটা চুক্তি করে নেয়। সেই চুক্তিতে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত ভারত মহাসাগর এলাকার ওপর (British Indian Ocean Territory B. I. O. T.) ব্রিটিশ-মার্কিন যৌথ খবরদারির কথা বলা হয়। বিখ্যাত দিয়েগো গার্সিয়া দ্বীপটি ছিল এই অঞ্চলের মধ্যেই। ১৯৭০ সালে মার্কিন কংগ্রেস দিয়েগো গার্সিয়ায় সামরিক ঘাঁটি তৈরির জন্য ৫.৪ মিলিয়ন ডলার মঞ্জুর করে, কাজ শুরু হয় ১৯৭১ সালের মার্চে। ভারতীয় উপকূল থেকে দু'হাজার কিলোমিটার দূরের এই দ্বীপে মার্কিন ঘাঁটি হওয়ার ফলে আরবীয় উপকূল থেকে অস্ট্রেলীয় উপকূল পর্যন্ত ভারত মহাসাগরে আমেরিকার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ছিল। অন্যদিকে এডেন বন্দর হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপকূলে নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল সোভিয়েত রাশিয়া। ফলে লঙ্ঘিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক সমুদ্রবিধি। ভারত মহাসাগর এইভাবে ঠান্ডা লড়াইয়ের ক্ষেত্রে পরিণত হওয়ায় উদ্বেগ বেড়েছিল ভারতের। সোভিয়েত রাশিয়া অবশ্য ভারত মহাসাগর নিয়ে কূটনৈতিক খেলার ব্যাপারটি অস্বীকার করেছিল। কিন্তু সে কথায় আস্থা ছিল না ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই-এর। ১৯৭৭ সালের ১৪ জুলাই লোকসভায় সাংসদ বসন্ত সাঠের একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "The Honourable member is wrong in stating that the Soviet Union has no base whatsoever. It has its spheres of influence in the Indian Ocean. That cannot be denied. It is an arms race between two powerful nations."

ভারত মহাসাগর নিয়ে দুই বড় শক্তির রেষারেষির কারণ ছিল তার সুবিধাজনক ভৌগোলিক অবস্থান। পারসীয় খাঁড়ি আর লোহিত সাগরকে সঙ্গে নিয়ে ভারত মহাসাগর মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে দূরপ্রাচ্য আর অস্ট্রেলিয়াকে যুক্ত করেছে; আবার সুয়েজ খাল হয়ে তা দূরপ্রাচ্য ও অস্ট্রেলিয়াকে ইউরোপ-আমেরিকার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। তার ওপর এর বিশাল উপকূল নানা সম্পদে সমৃদ্ধ ঃ উল, পাট, টিন, রবার, চা, তামা, সোনা, হিরে, ইউরেনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম আর তেল। তাছাড়া

এই সাগরের পাশাপাশি আরব সাগর, আর বঙ্গোপসাগরের কিছু এলাকা ব্যবহার করে 'পোলারিস' ডুবোজাহাজ আর ডুবোজাহাজ-বাহিত ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের আওতায় (Submarine-launched Ballistic Missiles–SLBMs) সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে। ইন্দোনেশিয়ার সমুদ্রনীতি-পণ্ডিত কারদি দিপেয়দ্যু (Kirdi Dipayudo) তাই বলেছিলেন, "The Indian Ocean's geographical location, the important sea routes which traverse it... are the main features of its strategic importance."

একই কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছেও ভারত মহাসাগরের গুরুত্ব ছিল। অস্ট্রেলীয় গবেষক গ্রেম গিল-এর (Graeme Gill) কথায়, "The Soviet deployment of vessels (as also its naval facilities) in Indian Ocean was ...concerned to provide a counter to the presence of the American craft in the region and, hopefully, to neutralize it."

দুই বড় রাষ্ট্রের এই ভারত মহাসাগরীয় ক্ষমতার লড়াই আফ্রিকা-এশিয়ার অবউপনিবেশিত রাষ্ট্রগুলোর কাছে ভয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নির্জোট আন্দোলনে শামিল এইসব দেশ চায়নি যে, ঠান্ডা লড়াই ভারত মহাসাগরের জল বেয়ে তৃতীয় বিশ্বকে গ্রাস করুক আর তার পরমাণু-অস্ত্র তাদের সার্বভৌমত্ব বা নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে তুলুক। ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে লুসাকা নির্জোট সম্মেলনে শ্রীলঙ্কা ও ভারত তাই যৌথভাবে ভারত মহাসাগরকে 'শান্তির এলাকা (Zone of Peace)' ঘোষণা করার দাবি তুলেছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি বলেছিলেন, "We would like the Indian Ocean to be an area of peace and co-operation. Military bases of outside powers will create tension and great power rivalry." এই প্রস্তাব মেনেও নিয়েছিল রাষ্ট্রসংঘ। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের (General Assembly) নেওয়া প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, "The General Assembly...solemnly declares that the Indian Ocean, within limits to be determined, together with the air space above and the ocean floor adjacent thereto, is hereby designated for all time as a zone of peace." এই একই প্রস্তাব আবার নেওয়া হয় ১৯৭২ সালের ১৫ ডিসেম্বর। ১৯৭৯ সালে রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তরে উপকূলীয় চুয়াল্লিশটি দেশের সভায় শান্তির প্রস্তাব দ্রুত কার্যকর করার কথা বলা হয়।

কিন্তু তবুও ভারত মহাসাগরকে ক্ষমতার লড়াই থেকে মুক্ত করা যায়নি। এর কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত, উপকূলের বেশ কয়েকটি দেশ ভারত মহাসাগরে

বড় শক্তির নিয়ন্ত্রণ থাকাটাকে তাদের নিরাপত্তার স্বার্থেই দরকার বলে মনে করেছে। যেমন পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা মনে করে, ভারতে যথাযথ নিরস্ত্রীকরণ না হলে ভারত মহাসাগরকে শান্তির এলাকা বলার কোনো যৌক্তিকতা নেই। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তান বা বাংলাদেশের সামরিক-শাসিত রাষ্ট্রগুলো আমেরিকার ওপর অস্ত্রের ব্যাপারে এত নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে যে, ভারত মহাসাগর থেকে আমেরিকাকে হাত গোটাতে বলার সাহসই তাদের নেই। তৃতীয়ত, ১৯৮০-র দশক পর্যন্ত উপকূলীয় অনেক দেশ নিজেরাই নানা সংঘাতে জড়িয়ে ছিল। যেমন, ১৯৭১ সালে ইথিওপিয়া-সোমালিয়া, ভিয়েতনাম-কাম্পুচিয়া; ১৯৭৩ সালে আরব-ইসরায়েল আর দীর্ঘ সময় ধরে ইরাক-ইরান।

সুতরাং ১৯৯০-এর সূচনা পর্যন্ত ভারত মহাসাগরকে 'Zone of Peace'-এ পরিণত করার ব্যাপারটি স্বপ্ন হিসেবেই থেকে গিয়েছিল। ১৯৯০ সালের পর বরং শান্তির পরিবেশ কিছুটা তৈরি হয়েছে। তার কারণ ভারত বা অন্য কোনো দেশের ক্ষমতা বৃদ্ধি নয়। তার কারণ সোভিয়েত রাষ্ট্রের ভাঙ্গন ও ঠান্ডা লড়াই-এর অবসান।